

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্‌, "বাণী প্রেস" হইতে
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার মা জননী—

যিনি সমস্ত বইএর মধ্যে
ভ্রমণের বই পড়তে
সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন,
যিনি সৃষ্টির মধ্যে
স্রষ্টার দর্শনানন্দে অভিভূত হন
তাঁর শ্রীচরণে
আমার এই বইখানি অর্পণ করে
আমি ধন্য হলাম।

সুষমা মিত্র

মুখবন্ধ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্বিপাকে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর সাধারণ যাত্রীদের ইয়োরোপ আমেরিকা যাতায়াত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছয় বৎসর বাদে যুদ্ধ অবসানের অল্পদিন পরেই কর্মসূত্রে স্বামী বেরিয়ে পড়লেন ইয়োরোপ ও আমেরিকার উদ্দেশে। সকন্যা আমাকেও তাঁর অনুগামিনী হতে হয়েছিল।

দেশে ফিরবার পর, ওদেশের যুদ্ধোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য অনেকেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করতেন। আমি ভ্রমণকালে ডায়েরী রেখেছি শুনে কোনও কোনও বন্ধু ঐ বিবরণ মাসিকপত্রে প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

তার মধ্যে দিদিমণির (কবি রাধারাণী দেবী) কাছ থেকেই প্রেরণা পাই সব চেয়ে বেশী।

আমি লেখিকা নই। সুতরাং লেখা প্রকাশে কুণ্ঠা ও সংকোচ যথেষ্টই বোধ করছি। বইখানির মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা যদি আমার এই ক্ষুদ্র দিনলিপিকাটি পড়ে কিছুটা আনন্দ পান, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সুবিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ এবং 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে আমার প্রথম রচনা "আকাশপথের যাত্রী" 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইতে মুদ্রিত কতকগুলি ছবির ব্লকের জন্য আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কাছে বিশেষ উপকৃত। 'ভারতবর্ষে'র বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমান বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ও এই পুস্তক প্রকাশে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এঁদের উৎসাহ ও আনুকূল্য না পেলে এই লেখা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না।

মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন 'বাণী প্রেসে'র কর্ণধার শ্রীযুত সমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক মহাশয়।

বইখানি প্রকাশ ব্যাপারে আমি আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের উৎসাহ ও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাঁদের স্নেহ, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা চিরদিনই আমার পাথেয়।

১লা অক্টোবর, ১৯৫১।

বিনীত নমস্কারান্তে ইতি

সুষমা মিত্র

ভূমিকা

'আকাশপথের যাত্রী' বিমান-পথে বিশ্ব-ভ্রমণের কাহিনী। আপন জন্মভূমির নিভৃত গৃহকোণে লেখিকার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। এই জীবনযাত্রা একদা বৃহত্তর বিশ্বের নানা বিভিন্ন দেশে বহুবিচিত্র মানবের মধ্যে কিছুদিনের জন্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

সদ্যঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ক্ষান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ইয়োরোপ আর বিজ্ঞান-যাদুকরের কুহকরাজ্য আমেরিকার বিচিত্র নগরী গুলিতে ঘুরতে ঘুরতে লেখিকা নানা অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সেই নব নব অভিজ্ঞতা তাঁর মনে বিস্ময় আনন্দ এবং বিশেষতর উপলব্ধির যে তরঙ্গ তুলেছে, সেই তরঙ্গগুলিই এই রচনার উপজীব্য।

আমাদের দেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মূলক বইয়ের সংখ্যা অতি অল্প। এই বইখানির মধ্যে লেখিকা গন্তব্য পথের অভিজ্ঞতা, উত্তীর্ণ স্থান সকলের বর্ণনা, দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সমাজগত বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের চিত্তে যেমন ভাবে প্রতিভাত হয়েছে,—সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এই বিবরণগুলির তথ্যের দিক্ দিয়েও একটি মূল্য আছে।

লেখিকা তাঁর স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে প্রবাসে দেশদেশান্তরে বহু উচ্চ শিক্ষিত সুধীজন-সমাজে নিমন্ত্রিত অতিথি রূপে মেলামেশা করেছেন। ঐ সকল বিজ্ঞান-তপস্বীদের গার্হস্থ্যজীবন ও অন্তঃপুরের চিত্র গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলির অন্যতম।

তিনমাসে লেখিকা প্রায় বত্রিশ হাজার মাইল, আকাশপথে উড়ে বেড়িয়েছেন, পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি। বহির্বিশ্বে বিচরণ কালে নানা অভিনব পরিবেশের মধ্যে তিনি যে-সকল ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তাঁর ডায়ারীর পেটিকায় কুড়িয়ে রেখেছেন, তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহ-পরায়ণ নারীমনের স্বাভাবিক রূপটি অপরিবর্তিতই আছে।

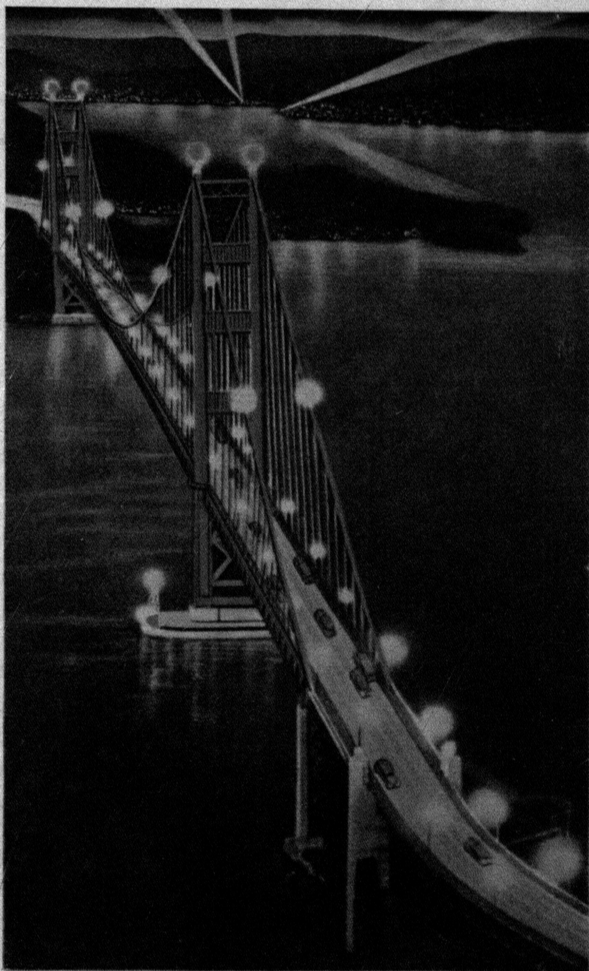
লেখার মধ্যে কষ্টকল্পনা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়াস না থাকায় পাঠকালে তৃপ্তি অনুভব করা যায়। সারল্য ও অনাড়ম্বরতাই একে

প্রসাধনহীন সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে। তথ্যের বিরাট সংগ্রহে রচনা ভারাক্রান্ত ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি, এও একটা সুখের বিষয় বলা যেতে পারে। বইখানি পড়তে পড়তে পাঠকের প্রীয়মান চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য মহাসমুদ্রগুলির বিভিন্ন পারে সঞ্চরণ করে আসার অবকাশ পায়।

দেশ-ভ্রমণে প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, অনেক স্থলে একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য দেখা যায়। এ ছাড়া প্রতি মানুষেরই দৃষ্টিকোণের প্রভেদ এবং উপলব্ধির ও রুচির বৈশিষ্ট্য আছে। সেদিক্ থেকে স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ভ্রমণ কাহিনীরই একটি নিজস্ব বিশেষ মূল্য আছে। 'আকাশপথের যাত্রী' বইখানির সেই দিক্ থেকেও সার্থকতা নিতান্ত সামান্য নয়।

শ্রাবণ, ১৩৫৮।

রাধারাণী দেবী



সানফ্রান্‌সিস্কোর বিশ্ববিখ্যাত সেতু—গোল্ডেন গেট ব্রীজ।

আকাশপথের যাত্রী

এক

করাচী-ইস্তাম্বুল

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ স্বামী এসে বললেন,—"বিলেত যেতে হবে; Dublin-এর আন্তর্জাতিক ধাত্রীবিদ্যা কংগ্রেস থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে।"

কিছুকাল থেকে বিদেশে যাবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু এত শীগগির যে যেতে হবে, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহোক, যেতে হবে তো হবে। আমার এক শ্রদ্ধেয়া বন্ধু, চলতি ভাষায় তাঁকে আমি দিদিমণি বলি, খবরটা শুনে মহা উৎসাহিত হ'য়ে বললেন—"শুভস্য শীঘ্রম্। আশ পাশের ভাবনা



দমদম বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত পরিবারবর্গ, বন্ধুগণ এবং R. W. A. C-র সদস্যগণের বিদায় অভিবাদন

ছেড়ে সহধর্মিণীর অধিকারটা এই সময়ে পূরো বুঝে নাও। এরকম সুযোগ বেশী আসে না" ইত্যাদি। শেষটায় তিনি বললেন—"তোমার ভ্রমণের একটা

ডায়েরী লিখে নিয়ে এস, উপভোগ্য হবে।" দিদিমণির হুকুম মানবার জন্য সরস্বতী দেবীর অকৃপা উপেক্ষা করেই এই ডায়েরী লেখা।

হিসেব ক'রে দেখলাম, তিন মাসে আমরা প্রায় ৩২ হাজার মাইল আকাশ-পথে বেড়িয়েছি এবং এই ৩২ হাজার মাইল ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় সব রকম বিমানেই উড়তে হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করবার পূর্ব্বেই সুইডেন আমেরিকাপ্রমুখ কয়েকটি ইউনিভার্সিটি থেকে ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আমার স্বামী ডাঃ মিত্রের কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল; সুতরাং আমাদের সুইডেন, ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড, আমেরিকা (পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত) এবং ক্যানাডায় ঘুরতে মোট ১৬খানি বিভিন্ন বিমানে চড়তে হয়েছিল। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই তিন মাসে যতগুলো প্লেন রাস্তায় ভেঙ্গেছে, এক মাত্র যুদ্ধের সময় ভিন্ন আর কখনও এরূপ হয় নি। প্রতিদিনই সকালে খবরের কাগজ খুল্‌লে দেখতে পেতাম "Plane crash"। ভালো ভালো কোম্পানীর প্লেন ভেঙ্গেছে এবং তার ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। নেহাৎ বৃহস্পতির জোর ছিল, তাই বোধহয় আমরা বেঁচে ফিরে এসেছি।

২৭শে এপ্রেল রবিবার। আজ যাত্রার দিন। ভোর ৬৷৷টায় B. O. A. C. কোম্পানীর অফিস ভিক্টোরিয়া হাউসে গিয়ে, মালপত্তর মায় নিজেদেরও ওজন নেওয়া হল; ৮টার সময় ওদেরই কোচে চড়ে দমদম বিমানঘাঁটি অভিমুখে চলেছি।

আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে যেতে মন কেমন করতে লাগলো। দেশের এই সাম্প্রদায়িক গোলমাল এবং অরাজকতার মাঝে তাঁরা সবাই রইলেন। আমরা চলেছি বহুদূরে—হয় ত খবর ঠিকমত পাব না। দমদম বিমানঘাঁটিতে নেমে দেখি, মা ভাই বোন ও R. W. A. C-র কর্ম্মিবৃন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিমান ছাড়বার সময় অল্পই বাকি ছিল, তাড়াতাড়ি সকলের সাথে দেখা করে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠলাম। বন্ধু বান্ধবের কণ্ঠে শেষ সম্বর্দ্ধনা "জয়হিন্দ" শুনে মন উতলা হয়ে উঠল।

বিমানটি ছোট, ভিতরে মাত্র ১২ জন যাত্রীর আসন রয়েছে। আমরা চেয়ারে বসে বেল্ট বেঁধে কানে তুলো দিলাম, চলা সুরু হল।

"আমাদের যাত্রা হোলো শুরু এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।"

জানলার ধারে বসে দেখতে পেলাম মা জননী মন্থর গতিতে ফিরে যাচ্ছেন। ভারাক্রান্ত মন আমার তাঁর উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানাল।



দমদম বিমানঘাঁটিতে কন্যা সহ লেখিকা

আকাশপথের যাত্রী

বিমানঘাঁটীর শেষ প্রান্তে এসে ভীষণ জোরে দম নিয়ে গর্জন করতে করতে বিমান আকাশে উঠে পড়লো। চাকা ছুটি ডানার ভিতর ধীরে ধীরে গুটিয়ে গেল। আমরা শূন্যে ভাসতে লাগলাম। হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন আনচান করে উঠলো। বিশ্রী রকম অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। ঝাঁকুনিতে ও আওয়াজে প্রাণ যায়। নিরুপায় হয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলাম। হাওয়ায় ভেসে চলেছি, কখনও উঠছি, কখনও নীচে নেমে পড়ছি।

আমরা ১০ হাজার ফুট উপরে উঠেছি, ২৫০ মাইল গতিতে বিমান ছুটে চলেছে। মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশে বিমান তীরের মত বেগে সোজা ছুটে চললো। আমি একটু সুস্থ হয়ে জানালায় তাকিয়ে দেখি নীচে যেন এক পুতুলের দেশ। শহরগুলি দোকানে সাজানো খেলনার মত, পাহাড় যেন মাটির ঢেলা, সুদীর্ঘ নদীগুলি এঁকে বেঁকে 'লতেব তন্বী' হয়ে চলেছে। পাশেই' দেখা যায় জিওমেট্রির যন্ত্রে টানা সোজা সরল রেখার রাজপথ। পৃথিবীর এই নতুন রূপ দেখে আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ষ্টুয়ার্ড এসে কাজুবাদাম, পেস্তা, লজেন্স, চুইংগাম আমাদের দিয়ে গেল। শেষে এক কাপ গরম কফি খুবই ভাল লাগল।

পাইলট এক টুকরা কাগজে তার বক্তব্য লিখে যাত্রীদের কাছে পাঠিয়েছে ; তাতে লেখা আছে—

> এখন যুক্তপ্রদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। ১০ হাজার ফুট উপরে ২৭৫ মাইল ঘণ্টায় চলেছি। বেলা ১২॥টায় দিল্লী পৌঁছাব। আকাশ পরিষ্কার।

বেল্ট বাঁধার হুকুম হল ; দেখতে দেখতে আমরা দিল্লীর ভূমি স্পর্শ করলাম। আমরা এখানে একঘণ্টা বিশ্রাম করে ডাক আসতে আবার বিমানে গিয়ে উঠলাম।

করাচী অভিমুখে চলেছি। একটু দূরে এসে দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিমান তুলতে লাগলো, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘের মাঝে পড়ে ওঠানামা করতে করতে চলেছে। আমাদের অবস্থা কাহিল। খুকু বমি করে ফেলেছে, আমারও গা গুলিয়ে উঠলো ; ষ্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি এক গেলাস

জল ও ওষুধ দিয়ে গেল। বমির ভাব তবুও যায় না। ইতিমধ্যে সোঁ সোঁ করে বিমান উঠে পড়লো তেরো হাজার ফুট উপরে, নীচে পড়ে রইল ঝোড়ো মেঘ। হঠাৎ আমার শরীরটা ভীষণ আনচান করে উঠল; শ্বাস কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শরীর যেন অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি অচৈতন্য হয়ে যাব। ইতিমধ্যে দেখি ষ্টুয়ার্ড এসে তাড়াতাড়ি সকলকে Gas Mask পরিয়ে দিতেছে। অক্সিজেন নিয়েই শরীর বেশ সুস্থ হল। লাঞ্চ্ এল, দিব্যি খেতে লাগলাম—কিছু টিনের মাছ, সব্জি ও এক পেয়ালা কফি।

আমরা রাজপুতানা পার হয়ে বিকেল ৪টের সময় করাচীতে নামলাম। B. O. A. C-র কোচ আমাদের করাচীর Palace Hotel-এ নিয়ে গেল। কথা ছিল Thos Cook আমাদের জন্য একখানি ঘর এখানে পূর্ব্বেই রিজার্ভ করে রাখবে। অফিসে গিয়ে খবর পেলাম তারা Thos Cook-এর কোন চিঠিই পায় নাই। এই সামান্য কয়েক-ঘণ্টা দূরের পথে এসে দেখি Thos Cook কিছুমাত্র কাজ করেনি। ভাবলাম, যাদের কথার উপর নির্ভর করে এই অজানা অচেনা সুদূর পথে যাত্রা, তাদের কর্মকুশলতা ও দায়িত্ববোধ এই? সত্যসত্যই যাত্রীদের কি ভীষণ বিপদগ্রস্ত হতে হয়! যাহোক্, হোটেল-ম্যানেজার তখুনি আমাদের ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। আমরা মালপত্র রেখে চা খেয়ে একটি ট্যাক্সিতে করে সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলাম। করাচী সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী ও ভারতের একটি বিখ্যাত বন্দর।* এই সমুদ্রসৈকতটির নাম ক্লিপ্‌টন্। সাগরপাড়ের উপর দিয়ে একটি বাঁধানো লম্বা রাস্তা সোজা জলের ধার অবধি চলে গেছে। সেতুটি পার হয়ে আমরা বালির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি এমন সময় সেখানকার প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বিদেশে পরিচিতের সাক্ষাৎ পেলে কি আনন্দই না হয়!

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে শহর ঘুরতে বেরোলাম। প্রথমেই গেলাম P. A.A-র অফিসে খবর নিতে যে বিমান কয়টায় লণ্ডন যাত্রা করবে। জানা গেল, বিমান তখন করাচী এসে পৌঁছায়নি, সুতরাং সব অনিশ্চিত। আজ

* তখনও ভারত বিভক্ত এবং স্বাধীন হয় নাই।

আর যাত্রার সম্ভাবনা নেই জেনে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখা হল Mr. J. C. Gupta-র সাথে; তিনিও লণ্ডনের পথে করাচী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক স্থানীয় বন্ধু; আলাপ পরিচয়ের পর তিনি তাঁর বন্ধুর মোটরে করে শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন।

রাস্তায় মালবাহী উটের গাড়ী দেখে খুকুর আনন্দ আর ধরে না। ঘুরতে ঘুরতে বেলা ২টায় স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের ডিরেক্টর ডাঃ শচীন সেনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে উপস্থিত হলাম। তারপর শহর ঘুরে বেড়িয়ে প্রায় ৭টায় হোটেলে ফিরেছি। এরোড্রমে ফোন করে জানা গেল যে পরদিন সকাল ৯৷৷৹টায় আমাদের বিমান লণ্ডন যাত্রা করবে।

পরদিন ২৯শে এপ্রেল, সকাল ৭টায় আমরা হোটেল ছেড়ে P. A A-র কোচে করে এরোড্রমে পৌছলাম। বিমানঘাঁটীর নিয়মানুসারে শুল্ক অফিস, পাসপোর্ট অফিস ও স্বাস্থ্য বিভাগের হাঙ্গামা সেরে বাইরে এসে দেখি প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত বিমান মাঠের মাঝে হাত পা ও ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যথাস্থানে বেল্ট্ বেঁধে বসতেই বিমান আকাশে উঠলো।

বিমানটি চার ইঞ্জিনের; আমরা মোট ৪২ জন যাত্রী চলেছি। তার মধ্যে চার পাঁচ জন ভারতীয়, আর বাকি সব ইউরোপীয়ান। বিমানের ঘর এয়ার-টাইট, জানালাগুলি ডবল কাঁচের, বাইরের আওয়াজ খুব কমই ঘরের ভিতর পৌছায়। বেশ আরামে চলেছি, কোন কিছু কষ্ট নেই। আমি জানালার ধারে বসে বাইরের অপূর্ব শোভা দেখছি—

পৃথিবীর ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট নদী পাহাড় ক্রমশঃ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে—দেখতে দেখতে তা'ও সব কোথায় মিলিয়ে গেল—এই বিশাল পৃথিবী একেবারে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। উপরে নীচে পাশে তাকিয়ে দেখি চারিদিক শূন্য; আমরা শূন্যে ভাসছি। আমরা কোথায় আছি ঠিক বুঝতে না পেরে একটু যেন কেমন কেমন মনে হতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষ আমরা, সমস্তক্ষণ পৃথিবীর মাটীতে জড়িয়ে থাকি, পায়ের তলায় মাটী নেই ভাবতেই ভয় করে।

আমি আমেরিকান ষ্টুয়ার্ডেস্‌কে জিজ্ঞেস করলাম—"কত হাজার ফুট উপর দিয়ে বিমান চলেছে?"

সে বল্‌লো—"প্রায় ১৭ হাজার ফুট হবে। বিশ বাইশ হাজার ফুট উপর দিয়ে সারারাত বিমান চলবে।"

ইতিমধ্যে পাইলটের শ্লিপ্ এল—

ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল বেগে ১৮ হাজার ফুট উপর দিয়ে বিমান চলেছে। তখন বাইরের টেম্পারেচার—১৫°, আকাশের আব-হাওয়া ভালোই।

বিমানের ঘর গরম, বাইরের ঠাণ্ডা আমরা কিছুই অনুভব করতে পারছি না। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, উপরে সূর্যের রশ্মি বড় প্রখর, নীচে মেঘের দল হু হু করে ছুটেছে। আমরা ইরাক ইরান পেরিয়ে পশ্চিমে তুরস্কের প্রায় শেষ সীমানায় এসে পড়লাম। বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠলো, ধীরে ধীরে আমরা তুরস্কের বন্দর ইস্তাম্বুলে নামলাম। তখন প্রায় ৫টা বাজে, আমরা এখানে এক ঘণ্টা থেকে সান্ধ্য আহার সেরে নেব।

কলিকাতার সময় হ'তে ২½ ঘণ্টা বাদ দিলে তুরস্কের সময় হয়। আমরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে চলেছি। বিমানঘাঁটী হ'তে ৪।৫ মাইল দূরে হোটেলের রেষ্টুরেণ্ট। রাস্তার দু'ধারে তুরস্কের ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে চলেছি। সবুজ ঘাসে ঢাকা পতিত জমিগুলি বেশ উর্বর বলেই মনে হল। ওয়েটাররা আধা-ইংরেজী ও আধা-তুরস্ক ভাষায় কথা বলে আমাদের বেশ যত্ন আপ্যায়িত করে খাওয়ালে। খাওয়া সেরে আমরা বাইরের বারাণ্ডায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম। চোখে পড়লো সামনের একটি বাড়ীতে একপাটি পুরাণো জুতা জানলায় ঝুলছে। স্থানীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, এখানে গৃহস্থেরা শুভ ও মঙ্গল কামনার্থে একপাটি পুরাণো জুতা ঐ রকম করে বাড়ীর সামনে ঝুলিয়ে দেয়—এটা এদেশের সংস্কার।

তুরস্কের নামের সাথে আমাদের মনে পড়ে কামালপাশার কথা, যাঁর দেশসেবায় ও ঐকান্তিক সাধনায় তুরস্কের জাতীয় জীবনে এক নব জাগরণের সাড়া এসেছে—আজ দেশ সর্ব বিষয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

রেষ্টুরেন্টে ও বিমানঘাঁটীতে বহু মহিলাকর্মী রয়েছেন। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা একেবারে পাশ্চাত্য অনুকরণের; তুরস্কের মহিলারা কর্মে যেমন তৎপর, ব্যবহারে তেমনি নম্র ও মার্জিত।



বিমানের অভ্যন্তরে আরোহিবৃন্দ

যথাসময়ে আমরা ফিরে গেলাম, বিমান আকাশে উঠলো। খুকু আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমালো, যাত্রীরাও একে একে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, এর মধ্যে আবার নাক ডাকাও শোনা যাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে আছি; ভীষণ ভাবনা হচ্ছে কি করে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমানো যাবে, সারারাত হয় তো জেগেই কাটবে! ঘন অন্ধকারময় আকাশে বিমান তীর বেগে ছুটে চলেছে।

তখন প্রায় রাত তিনটে; হঠাৎ দেখি ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল—"Fasten seat belt, no smoking"; সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন শহরের রাস্তার আলো দুধারের জানলা দিয়ে দেখা গেল। ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে সকলকে জাগিয়ে দিলে। এরোপ্লেনের বাঁশী বেজে উঠলো, আমরা ধীরে ধীরে লণ্ডনের হিট্‌রো বিমানঘাঁটিতে নামলাম।

দুই

লণ্ডন

বিমানের দরজার সামনে আসতেই ঝড়, বৃষ্টি ও শীতে কেঁপে উঠলাম; শীতে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে বিমানঘাঁটির বসবার ঘরে ঢুকলাম। ঘর বেশ গরম করা রয়েছে—কি আরামই না হ'ল। পরক্ষণেই আবার হাঙ্গামা স্থুরু হল—মালপত্তর পরীক্ষা, পাসপোর্ট দেখানো ও কাগজপত্রে সই করা। সব কিছু সারা হলে আবার ফিরে এলাম বসবার ঘরে। Thos Cook-এর লোকের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছি; হোটেলের ঘর রিজার্ভ করার ভার তাদেরই উপর ছিল। কিন্তু কোথায় তারা! তাদের একটি লোকেরও দর্শন মিললো না।

এই অন্ধকার রাতে কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় একজন পোর্টার একখানি টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। আমাদের জনৈক লণ্ডনবাসী বন্ধু—Mrs. Jacob লিখে জানিয়েছেন যে একটি হোটেলে আমাদের জন্য ঘর রিজার্ভ করা হয়েছে। বুঝলাম, আমার স্বামী Thos Cook-এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে এঁদেরও ঘরের জন্য লিখেছিলেন। যা হোক্, খুব খুশী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমরা মালপত্তর নিয়ে P.A.A-র কোচে গিয়ে বসলাম।

চারিদিক অন্ধকার, জনমানবহীন রাজপথ, শুধু পথের দু'ধারে মিট্‌মিট্ করে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। স্তব্ধ নিরালা পথে আমাদের একখানি মাত্র গাড়ী চলেছে। ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে বাকিংহাম্ প্যালেস্ রোডে এয়ারওয়ে টারমিনাসের সামনে বাস এসে দাঁড়ালো। তখনও আকাশ অন্ধকার, নিস্তব্ধ শহর নিঝুমপুরীর মত ঘুমিয়ে আছে।

আমরা টারমিনাসের বসবার ঘরে বসেছি; এক একবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখছি, গাড়ী চলাচল স্থুরু হল কিনা। লণ্ডনের জনহীন পথে দাঁড়িয়ে দেখি—ধীরে ধীরে আকাশ ভোরের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো, রাস্তায় দু'একটি পথিকের চলাফেরাও স্থুরু হল। ভীষণ ঠাণ্ডায় আর বাইরে দাঁড়ানো গেল না। আমরা ঘরের ভিতর গিয়ে একজন এয়ার-অফিসারকে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি আনিয়ে দিতে বললুম। তিনি তখনই ফোনে

খবর দিলেন; গাড়ী এসে গেল, আমরা Hotel Mapleton-এর দিকে রওনা হলাম। পথের দু'ধারে কালো পোড়া ভাঙ্গাবাড়ীর সারি দেখতে দেখতে চলেছি। বাকিংহাম্ প্যালেস্ পেরিয়ে পার্লামেন্টের জোড়াবাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে এসে চৌমাথায় একটি কালো বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়ালো—এইটিই Hotel Mapleton।

এত ভোরে হোটেলের সবটাই নিস্তব্ধ; কেবলমাত্র একটি লোক নীচের Reception অফিসে বসে ঢুলছে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, ঘর আমাদের রিজার্ভ হয়েছে, তবে বেলা ১২টার আগে মিলবে না। কি করা যায়! লোকটি পরামর্শ দিল উপরে বসবার ঘরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে এবং নিজেই আমাদের মালপত্তর সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। এখনকার মত থাকার আস্তানা যখন ঠিক হ'ল, তখন আমরা প্রথম অনুভব করতে লাগলাম যে 'বিলেতে' এসেছি।

এই সেই বিশ্ববিশ্রুত বিলেত, যা ছাত্রসমাজের তীর্থস্থান, বিজ্ঞান-সমাজের আদর্শ পীঠ, ব্যবসায়ীর কর্মস্থল—এক কথায় আধুনিক পৃথিবীর আকর্ষণ কেন্দ্র।

বসবার ঘরের পাশেই ছিল স্নানের ঘর, আমরা সেখানে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখি—রাস্তায় সবেমাত্র ২।১টি গাড়ী চলাচল সুরু হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট ওয়েলার ঘোড়াগুলি বড় বড় মাল বোঝাই করা গাড়ীগুলি টেনে নিয়ে ঠপ্ ঠপ্ করে চলেছে, তাদের ক্ষুরের শব্দ নির্জনপথে দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ করে উঠছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই লণ্ডনের রাজপথ সরগরম হয়ে উঠল। যানবাহন ও পথচারীতে রাস্তা ভরে গেল; লোকের ভীড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটা দায়! লোকগুলা তো হাঁটছে না যেন ছুটছে। ভোরের হাওয়ায় আমরাও একটু বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। তিন তলার দু'খানি ঘরে বাক্স গুছিয়ে রেখে প্রাতরাশ হোটেলেই সেরে জেকব পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

লণ্ডনের Underground Tube Station-গুলিতে যাত্রীদের যাতায়াতের অতি উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত রয়েছে। মাটীর তলায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ-গুলি যাত্রী নিয়ে অনবরত শহরের দূর দূরান্তে ছুটে চলেছে, প্রতি ষ্টেশনে প্রায় দু'এক মিনিট অন্তর ট্রেণ আসছে, যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় না।

আমরা তিন মিনিটের মধ্যেই বন্ধুর বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে বেশ খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে বেলা ১টায় Rotary club-এ উপস্থিত হলাম।

বিদেশী রোটারিয়ানরা খুবই আলাপ আপ্যায়িত করলেন; স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট তাঁর পাশে আমাদের স্থান করে দিলেন। লাঞ্চ খাওয়া আরম্ভ হল; সেদিনের বক্তব্য বিষয় ছিল 'World Peace'; বক্তার পাঠ শেষ হলে আলোচনা চলল।

আলোচনা প্রসঙ্গে উনি দাঁড়িয়ে বললেন—"শান্তির একমাত্র পথ হল পরার্থে আত্মদান। এ ছাড়া কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতীয় জীবনে, কি বিশ্বজগতের পক্ষেই হউক না কেন, শান্তি আসা অসম্ভব। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি—যে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষদের আত্ম-ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে লেখা রয়েছে। তাঁরা নিজের জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন শান্তি ত্যাগেই মেলে। সেই বুদ্ধের যুগ হ'তে আজ এই গান্ধীর যুগ অবধি সেই একই বাণী আমরা শুনে আসছি। এটোম বোমার শক্তি যে অসীম তাতে সন্দেহ নেই; তা দিয়ে জগৎকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা হতে পারে না।"

রোটারিয়ানরা পরস্পর একটু মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। যাহোক, মুখে প্রশংসা ও খুশীর ভাব খুবই প্রকাশ করলেন। সভা ভঙ্গ হল।

বিকেল বেলা হোটেলেই চা খেয়ে আবার পদচারণে বেরিয়েছি। লণ্ডনের রাস্তার দু'ধারে আধাভাঙ্গা পোড়া বাড়ীর সারি দেখতে দেখতে চলেছি, লাইনের পর লাইন, রাস্তার পর রাস্তা বাড়ীগুলি জ্বলে পুড়ে ঐ একই অবস্থায় রয়েছে। এই সকল ধ্বংসস্তূপের মাঝে কোথাও আবার বাড়ীগুলি বোমা বিধ্বস্ত হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, সেখানে হয়ে রয়েছে শুধু বড় বড় গর্ত। সন্ধ্যা হ'তে একটি রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে সেদিনের মত বেড়ানো শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ১লা মে। আমরা সকালেই জিনিষপত্তর গুছিয়ে বাক্সে তুলে ফেল্লাম। হোটেলের হিসাব চুকিয়ে বেলা ১২টার সময় ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে গেলাম লাঞ্চ খেতে। বেলা ৩টার সময় ফিরে এসে মালপত্তর নিয়ে এয়ারওয়েটারমিনাসে উপস্থিত হলাম।

তিন

ষ্টকহল্‌ম

সুইডিশ এয়ার লাইনের একটি বড় বিমানে ওঠা গেল। বিমানের ভিতরে দু'জন ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে আমাদের জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়েই রইল; শেষে একটু ফিক্ করে হেসে এক ট্রে চুইংগাম নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন দেশ থেকে আসছি। হাসতে হাসতে বললে—"কি সুন্দর তোমার পোষাক (costume)।"



ষ্টকহল্‌ম শহর (আধুনিক পল্লী)

বিমান আকাশে উঠে পড়লো। আমরা মোট ১৬ জন যাত্রী চলেছি, অর্দ্ধেকেরও বেশী চেয়ার খালি পড়ে আছে। ষ্টুয়ার্ডেস্‌রা অনবরত কেক্, বিস্কুট, চা, কফি দিয়ে যাচ্ছে। খুকু আর উনি মনের সাধ মিটিয়ে অনবরত মিষ্টি খেয়ে চলেছেন। তারপর খুব খুশী হয়ে শেষে মন্তব্য করলেন যে সুইডিশ এয়ার লাইনের বিমানই সব চেয়ে বেশী ভালো।

আমরা ৮ হাজার ফুট উপরে উড়ে চলেছি। উপরে গাঢ় নীল আকাশ, নীচে ছেঁড়া মেঘের টুকরো চারিদিকে ছড়ানো, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে পৃথিবীর ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট। মনে হচ্ছে, কে যেন তুলো ধুনে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

দলে দলে ভেসে আসছে শাদা ধব্‌ধবে স্তবকমালা; স্তবকের পর স্তবক স্তরে স্তরে জমে উঠছে,—পৃথিবীর সব ফাঁক ঢেকে দিয়ে অসংখ্য স্তবকমালা আকাশ জুড়ে ভেসে উঠল—এ যেন এক ফেনিল মেঘসাগর—কি অপূর্ব দৃশ্য! আমি অনিমিষে চেয়ে আছি। পৃথিবী যেন কোন শূন্য-লোকে মিলিয়ে গেছে। নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। আমরা যেন কোন অজানার যাত্রী, মেঘ-রাজ্যের এই যাত্রীর দল থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাবছে এ রাজ্যে আবার এরা এল কারা! বিশ্ব যেন মৌনমুনি!



ষ্টকহল্‌মের টাউনহল (CityHall)

ঘরের ভিতর ফিরে দেখি সামনের কাঁটা দশ হাজার ফুট অবধি উঠেছে। আমি ওদের সকলকে বাইরের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে ডাকলাম। মেঘের দেশে মেঘের খেলা দেখে চোখ আর ফিরানো যায় না।

আমরা নর্থ-সির সুদীর্ঘ আঁকা বাঁকা তীররেখা পেরিয়ে সুইডেনের উপর এসে পড়লাম। বিমান গোটেনবুর্গে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালো। আমরা

নেমে এরোড্রমের ওয়েটিংরুমে গেলাম। পৃথিবীর মাটিতে নেমে কেবল মনে হতে লাগলো—এতক্ষণ যেন কোথায় কোন মেঘের রাজ্যে ছিলাম। নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না—চলচ্চিত্রের ছবির মত মুহূর্তে সব বদলে গেল; চোখে ধাঁধা লাগে, মনে বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমরা এখানে কিছু পাউণ্ড সুইডিশ ক্রোণে বদলে নিলাম। এদেশের লোকেরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুইডরা দীর্ঘকায়, খুবই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাদের পাশে আমরা ছোট্টখাট্ট মানুষ। এখানে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডাক এল, আবার বিমানে উঠলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টকহল্‌মে পৌঁছে গেলাম।

যথারীতি কাষ্টম ও পাসপোর্টের হাঙ্গামা সেরে বেরিয়ে আসতেই চারিদিক থেকে ছবিওয়ালাদের ভীড় জমলো,—নতুন দেশের নতুন মানুষের ছবি চাই। সামনেই দেখি Prof. Heyman, এখানকার স্বনামধন্য বিশ্ববিশ্রুত স্ত্রীরোগচিকিৎসক। তিনি গাড়ী নিয়ে এসেছেন আমাদের নিতে। অভিবাদনাদি শেষ হবার পর আমরা প্রফেসরের গাড়ীতে করে শহরের দিকে রওনা হলাম। বাইরে কন্‌কনে শীত—তাপ প্রায় ৩৬°, আমাদের মোটর কিন্তু গরম করা, ঠাণ্ডা বুঝতেই পারছি না। প্রফেসার বললেন, এখন শীতের শেষ, জমির বরফ গলছে, গাছে এখনও একটি পাতা বেরোয়নি। শুনলাম, শীতকালে টেম্পারেচার শূন্য থেকে ২৫।৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট নেমে যায়; Baltic Sea তখন জমে বরফ হয়ে যায় এবং সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে ওপারের দেশগুলিতে নাকি যাওয়া যায়।

প্রফেসারের সাথে গল্প করতে করতে মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। Hotel Plaza-তে তিনি আমাদের জন্য ২ খানি ঘর রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। চমৎকার সাজানো ঘর, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, ঘরের টেম্পা-রেচার তখন ৬০°, আমরা ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

২রা মে। সকালে কাগজওয়ালারা আবার ছবির জন্য এসে হাজির। আমাদের সাজ পোষাক ও বিদেশী চেহারা তাদের মহাবিস্ময়ের কারণ হল—ঔৎসুক্যের অবধি নেই। আমার জরিপাড় শাড়ী, খুকুর সাল্‌ওয়ার সুট ও ওঁর গলাবন্ধ কোট দেখে Costume-এর প্রশংসা আর ধরে না। ছবি তোলা

হলে ভারতবর্ষের নানা কথা জিজ্ঞেস করল, তারপর ওঁর কাজকর্মের খবর লিখে নিয়ে বিদায় নিল। বোঝা গেল, তারা ভারতের বিষয় কিছুই জানে না। পৃথিবীর এককোণায় এদের বাস, দেশদেশান্তরের মানুষদের চোখে দেখার সুবিধা এরা পায় না; পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসিয়া মহাদেশের খবরাখবর জানার সুযোগ এদের ভাগ্যে খুব কমই জোটে।

আমরা প্রাতরাশ ঘরের ভিতরই সেরে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। বাইরে এসে শীতে কেঁপে মরি। সামান্য একটু ঘুরেই আমি হোটেলে ফিরে এলাম। উনি গেলেন হাসপাতালে। এ দেশে লাঞ্চের সময় হল ১১টা হ'তে ১টা, ডিনার ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে শেষ করতে হয়। উনি ফিরে এলে ১২টার সময় লাঞ্চ খেয়ে আমরা ট্রামে করে চললাম শহর প্রদক্ষিণ করতে।

ষ্টকহলম ছোট শহর, লোক কম; সারা সুইডেনেরই লোকসংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ। ম্যালারণ হ্রদ ও বল্টিক সাগরের সঙ্গমস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-সমষ্টির উপর এই শহর প্রতিষ্ঠিত। ষ্টকহলমের শোভা হ্রদে। সরু লম্বা হ্রদগুলির উপর নানা রঙের দাঁড় টানা নৌকা, মোটর লঞ্চ ও ষ্টীমার



দীপান্বিতা নগরী

ভাসছে। আমরা শহর প্রদক্ষিণ করে একটি রেষ্টুরেন্টে আহারাদি সেরে হোটেলে ফিরে গেলাম।

রাত ১১টার সময় গরম কাপড়ের বোঝা পরে কনকনে শীতে রাস্তায় হাঁটতে, বেরিয়েছি। বিজ্ঞাপনের আলোয় রাস্তা আলোকিত—দোকানে কাঁচের জানলার ভিতরে সাজানো বহু রকমারি জিনিষ দেখতে দেখতে চলেছি। পথের দু'ধারে রেষ্টুরেন্টগুলি নৈশ আহারের আমোদে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। আমরা ঘন্টাখানেক বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ৩রা মে। আমরা সকালে উঠে খবরের কাগজ খুলে দেখি আমাদের তিনজনের ছবি বেরিয়েছে, ছবির নীচে সুইডিশ ভাষায় কত কিছু লেখা, একবর্ণও পড়তে পারলাম না। হঠাৎ চোখে পড়লো ওঁর



সুইডিশ সংবাদপত্রে আমরা

কপালে টিপ, ছবি দেখে আমরা তো হেসে বাঁচি না। কি মজার ব্যাপার! তাড়াতাড়ি ছবিটা কেটে নিলাম, কোলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠাতে হবে। তারপর হোটেলের একজন মহিলা কর্মীর কাছে কাগজ নিয়ে গেলাম, তিনি পড়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিলেন।

বাইরে রোদ নেই, বরফের গুঁড়োর মত বৃষ্টি পড়া সুরু হল; বুঝলাম আরো ঠাণ্ডা পড়বে। যত কিছু গরম কাপড় পরিনা কেন, শীতের কষ্টে পথে চলা দায়।

খাওয়া সেরে রাস্তায় বেরিয়েছি, কাঁপুনি ধরল, দৌড়ে দৌড়ে চলেছি। পার্কে পাইন-গাছের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে এয়ার অফিসের গরম করা ঘরে প্রবেশ করলাম। উনি কাজ সেরে সেখান থেকে হাসপাতালে চলে' গেলেন, আমরা বাইরে এসে দেখি, রোদ উঠেছে। মিঠা রোদের আমেজ লেগে প্রকৃতি হাস্যোজ্জ্বলা। পার্কে এসে রোদ পোওয়াতে বসলাম। রোদ আর গায়ে লাগে না,—অসহ্য শীত, ছুটে চললাম হোটেলের দিকে।



ষ্টকহলমের রাজপথ

সূর্যদেবের বর্ণচ্ছটার ঘটা খুব, কিন্তু তাপ নাই।

এদেশের লোকদের রং খুব ফর্সা; মেয়েরা বেশ সুশ্রী, চেহারায় কোমলতা আছে। নীল চোখের উপরে টানা কালো ভুরু ও মাথায় কালো চুল বেশ সুন্দর দেখতে—মোটের উপর এরা বেশ সুন্দরী।

শীতের দেশের জীবজন্তুগুলি লম্বা ঘন লোমে ঢাকা। প্রকৃতির সাথে লড়তে হয় বলে তারাও নিজেদের প্রয়োজন মত দেহাবরণ তৈরী করে নিয়েছে, —নচেৎ বাঁচা অসম্ভব হত।

আজ বিকেলে প্রফেসার হেম্যোনের (Prof. Heyman) বাড়ীতে আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। সেখানে আরো দশ বারো জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসেছেন। আলাপ পরিচয় হল; বসবার ঘরে বসে সব গল্প করছি।

প্রফেসারের স্ত্রী নেই ; একটি বিবাহিতা কন্যা, জামাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ আমাদের ঘিরে নানা রকম প্রশ্ন করছেন। প্রফেসার বেরভ্যন (Prof. Bervan) বেশ রসিক মানুষ, নানা রকম মজার গল্পে আসর জমিয়েছেন।

শুন্লাম, আমাদের আসার আগের দিন এখানে এক ঋতু উৎসব হয়ে গেছে। স্কুল, কলেজ ও অফিস বন্ধ ছিল। লোকেরা সব রাস্তায় রাস্তায় প্রশেসন করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে আনন্দ করেছে। গ্রীষ্মের আগমনে সূর্যদেবের আরাধনা এমনি করে দেশবাসীরা করেছে। এখানে সূর্যের এত



গ্রীষ্ম উৎসব

অভাব যে গ্রীষ্মকালে রোদ উঠবে বলে লোকেরা এখন থেকেই আনন্দ করছে। শীতের অবসানে গ্রীষ্ম আগতপ্রায়।

এঁদের সাথে কথাবার্তা বলে বোঝা গেল যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। এ দেশে কোন বইও বোধহয় নেই। শুনলাম, সুইডেনের স্কুল কলেজে ও অন্যান্য ইন্‌ষ্টিটিউশনে সব কিছুই সুইডিশ ভাষায় শেখানো হয়। বিদেশী ভাষার বইগুলি সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করে পড়ানো হয়। যাঁরা বিদেশী ভাষা শিখতে ইচ্ছুক তাঁরা অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে সে সকল ভাষা শিখতে পারেন। সুতরাং ইংরাজী এ দেশে খুব কম লোকই জানেন। অর্ধেক নিমন্ত্রিত মহিলাদের সাথে আমি একটি কথাও বলতে পারলাম না, কারণ তাঁরা ইংরাজী জানেন না, আর আমিও সুইডিশ ভাষা এক বর্ণও বুঝি না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম—যখন একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—ভারতবর্ষে রাস্তায় রাস্তায় সাপ হাতি বেড়ায় কিনা। আমি হাসি চাপতে না পেরে একটু জোরেই হেসে উঠেছি। তারপর বললাম, শহরের পরিষ্কার পাকা বাঁধানো রাস্তায় আজকের এই সভ্যসমাজে কোথাও কখনও কি সাপ হাতি বেড়িয়ে বেড়াতে শুনেছেন? ভারতবর্ষের জঙ্গলে থাকতে পারে, শহরে তো নয়। তবে সে কেবল ভারতে কেন, সারা পৃথিবীর জঙ্গলই তো বন্য জীবজন্তুর আবাসভূমি।

ডিনারের ঘণ্টা বাজলো, সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্তা ও কর্ত্রী এগিয়ে এসে অতিথিদের হাতে হাত গলিয়ে এক এক জনকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সবাই মিলে টেবিলে বসে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন, তারপর গেলাস তুলে ধরে Scoll বলে খাওয়া আরম্ভ করলেন।

অতি সুন্দর সাজানো টেবিল, কাটগ্লাসের বাসন ঝকঝক করছে, বাতিদানীতে মোমের বাতি জ্বলছে। উৎকৃষ্ট রান্না, টাটকা খাদ্যদ্রব্য এবং চমৎকার আইসক্রীম।

খাওয়া শেষ হলে সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্তার সাথে হ্যাণ্ডসেক করে ধন্যবাদ জানালাম। বসবার ঘরে সবাই কফি খেলাম।

প্রফেসারের মেয়েরা আমাদের শাড়ীতে জরির কারুকার্য দেখে ভারতীয় শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই সাঁচ্চা জরি ও সিল্ক তাঁদের খুবই পছন্দ।

তারপর, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাদেশিক নানা রকম গল্প গুজব চলল।



ষ্টকহলমের আধুনিক টেলিফোন ফ্যাক্টরী

শুনলাম, এই যুদ্ধের সময় এখানে ভাইভোসের

সংখ্যা নাকি দ্বিগুণ বেড়েছে, তাতে সমাজপতিরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিবাহের কথা উঠলো। আমাদের দেশে মেয়েরা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যায় এবং সেখানে সবাইকার সাথে একত্রে একজায়গায় বাস করে—এ তারা কেমন করে পারে? এত বড় কঠিন সমস্যার সমাধান না করতে পেরে শেষে সরল সোজা ভাষায় আমাদের জিজ্ঞেস করে ফেললেন। বললাম—"হাঁ, তারা একটু কষ্ট করে বৈকি। একত্রে বাস করতে গেলে স্বার্থ-ত্যাগ কিছু করতেই হয়। জীবনে এইটুকু কষ্টস্বীকার তারা অনায়াসেই করে—এটা কর্তব্য বলেই মনে করে। বৃদ্ধ শ্বশুরশাশুড়ীকে আমরণ সেবা যত্ন করা কি মনুষ্যত্বের দিক থেকেও বড় কাজ নয়?"

দেখলাম, তখন তাঁরা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—'সত্য'!

যাক্, সময় কাটল ভালোই। এতক্ষণ ধরে বকতে বকতে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত; খুকুর অবস্থাও কাহিল, ঘুমে তার চোখ দু'টি প্রায় অর্ধমুদিত। প্রফেসার ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে ফোন করতেই ট্যাক্সি এসে দরজায় হাজির। আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

পরদিন ৪ঠা মে। ঘুম থেকে উঠেছি বেলায়। চিঠি-পত্তর লেখার পালা সকালেই সেরে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি।

শিশুদের শাদা রঙের ঠেলাগাড়ীগুলি সারি সারি চলেছে পার্কের দিকে। শিশুদের দেখে বয়স বোঝা যায় না—যেমন মোটাসোটা তেমনি বড় ও হৃষ্টপুষ্ট। এ দেশের শিশুর ওজন আমাদের দেশের শিশুর প্রায় দ্বিগুণ। সুইডদের দৈহিক আকৃতি যেমন বিশাল, আয়ুও তেমনি খুব বেশী। আশী পঁচাশী বৎসর বয়স্কদের পঞ্চাশের অধিক বলে মনে হয় না। অধিক বয়স অবধি কর্মক্ষমও থাকে। ওঁর কাছে শুনলাম যে গতকাল হাসপাতালে এক রোগী এসেছিল তার বয়স মাত্র ১০৫ বৎসর। দেহ তার খুবই সুস্থ, তবে একটু যা' চর্মরোগ হয়েছে।

আজ রাতে অপেরায় যাওয়া গেল। অপেরায় জাঁকজমকের ধরণ-ধারণ দেখে চমক লাগে। প্রকাণ্ড বড় ষ্টেজ, অদ্ভুত দৃশ্যপট, দৃশ্যপরিবর্তনের কায়দাই এক আশ্চর্যরকমের। আমাদের হোটেলে ফিরতে রাত হল অনেক।

৫ই মে। আজ সকালে এক জর্ণালিষ্টের পাল্লায় পড়লাম। তারা ছবি নিতে চায়, তাই আপ্যায়িতের অন্ত নেই। খুকু বল্লে—"বাবা কাগজে তো তোমার কপালে টিপ দিয়েছে, যদি ওদের বইতেও ঐ রকম ছাপায়?" সুতরাং তার সমস্যার সমাধান করতে জার্ণালিষ্টদের টিপের তথ্যটি জানিয়ে দিলাম।

ছবি তোলা হলে তারা আমাদের এখানকার Skansen মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানে বরফের দেশের শাদা লোমে ঢাকা শ্বেতভল্লুক ও জলের মধ্যে শীলমাছ দেখে খুকু আনন্দে লাফিয়ে উঠল; বল্লে, শীতের দেশের আরো জীবজন্তু দেখতে হবে। বড় লোমে ঢাকা ব্রাউন রঙের ভাল্লুকটি এই শীতে তিনটি বাচ্ছা নিয়ে ঝরণার জলে বসে গা ভেজাচ্ছে।

ছোট ছোট অল্প উঁচু পাহাড়গুলির চূড়ায় এই Skansen অবস্থিত। এখান থেকে সারা শহরের দৃশ্য ছবির মত দেখায়। বহু প্রাচীন কয়েকটি সুইডিশ কটেজ নানাস্থান হ'তে তুলে এনে এখানে স্মৃতিস্বরূপ রাখা হয়েছে।



হ্রদের ধার, ষ্টকহলম

তার ভিতর রয়েছে তখনকার লোকেদের ব্যবহৃত জিনিষপত্তর; তখনকার পোষাক, গহনা ও আসবাবে বেশ সূক্ষ্ম কাজকরা। যুদ্ধের জন্য পিতলের বর্ম ও আরো নানা রকম সাজসজ্জা ব্যবহার করা হত। মোট কথা, দেখা যায়, সুইডিশ সভ্যতা আজকের নতুন নয়। কালের স্রোতে কি ভাবে কোথায় ভেসে

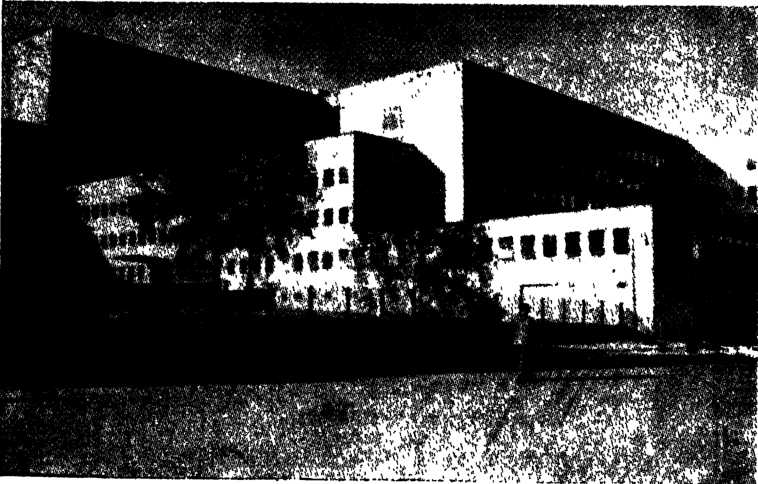
গিয়েছিল জানা নেই, আজ আবার সেই মাটীতেই নতুন করে নতুন শহর গড়ে উঠেছে। আমরা পাহাড়ের উপরে বেড়িয়ে একটু পরেই ফিরে এলাম।

আজ রাতে Prof. Bervan-এর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। আমরা ৭টায় সেখানে উপস্থিত হয়েছি। হ্রদের ধারে ছোট্ট একটি ফ্লাটে তিনি ও তাঁর স্ত্রী থাকেন ; স্থানটি অতি মনোরম।

আমরা যেতেই প্রফেসারের স্ত্রী এসে হাসি ভরা মুখে আমাকে ও খুকুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে—যেন কত দিনের পরিচিত! প্রফেসার ইংরাজি ভাষা কিছু জানেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী সুইডিশ ভাষা ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না।

এঁরা স্বামী স্ত্রী উভয় অতি সরল প্রকৃতির ; ব্যবহারে অমায়িকতার অন্ত নেই। প্রফেসারের স্ত্রী আমাদের আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। তারপর নিজে গিয়ে বসলেন পিয়ানোতে, অতি অপূর্ব বাজালেন!

মানুষ ভাষাহীন হয়েও যে তার হৃদয়ের আন্তরিকতা দিয়ে ও ভালবাসার গভীরতা দিয়ে কতখানি অন্যের মন স্পর্শ করতে পারে তা আজ সত্যই অনুভব করলাম।



ষ্টকহলমের একটি আধুনিক হাসপাতাল

খাবার পর অল্পক্ষণ গল্প-সল্প করে বিদায় নিলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, হ্রদের জলে রূপালী রং ঝক্‌মক্ করছে। ঠাণ্ডা

কননে হাওয়ায় বেশীক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো যায় না। প্রফেসারের গাড়ীতে করে হোটেলে ফিরে এলাম।

৬ই ও ৭ই মে আমরা অল্প স্বল্প শহর বেড়িয়ে কাটিয়েছি। একটু ঠাণ্ডা লেগে শরীর অসুস্থ হয়েছিল। যাহোক্, অল্পের উপর দিয়েই গেল। আমরা মাত্র কালকের দিনটি এখানে আছি।

পরদিন ৮ই মে। আজ সকালে গেলাম হাসপাতাল দেখতে। বিরাট বাড়ী, ভিতরে উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। মহিলা সেক্রেটারী আমাদের সাথে করে ঘুরে হাসপাতাল দেখাতে লাগলেন, শেষে গেলাম রান্নাবাড়ীতে। রান্নাবাড়ীটি একটি কারখানা বিশেষ, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কি না হচ্ছে। ২০০০ রোগীর রান্না মাত্র কয়েকজন মিলে করছে। সেক্রেটারী মিঠাপুরী এনে আমাদের খেতে দিলেন। আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।



ষ্টকহলমের বিখ্যাত রেডিয়াম হাসপাতাল
(Radium hemmet)

বিকেলে Eden Hotel-এ কয়েকজন প্রফেসার ও তাঁদের পত্নীদের চা'য়ে নিমন্ত্রণ করেছি। খুকু ভারতীয় নৃত্য দেখালো। নাচ দেখে তারা ভারি খুশী। এবারকার মত সকলকার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম নিলাম।

দিনের আলো এখানে এখন রাত ১টা অবধি থাকে। শীতকালে এদেশে দিন ছোট হতে হতে প্রায় এক ঘণ্টায় দাঁড়ায়—সূর্য বেলা দু'টায় উঠে তিনটায় অস্ত যায়। তেমনি আবার গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হতে হতে মাত্র এক ঘণ্টা অন্ধকার হয়—সূর্য রাত তিনটার সময় উঠে তার পর দিন রাত দুটায় অস্ত যায়।

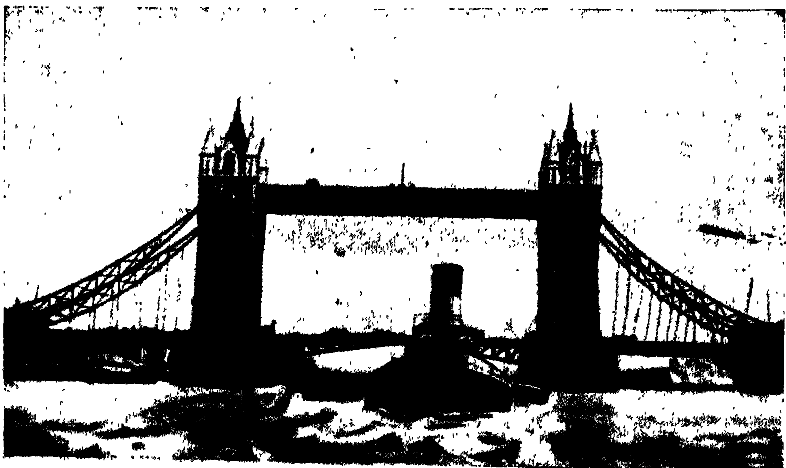
রাত ৯টা বাজে; আমরা জানালার পর্দা টেনে শুয়ে পড়লাম, এখনও দিনের আলো আকাশে রয়েছে।

পর দিন ৯ই মে। আমরা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বাক্স গুছিয়ে হোটেলের হিসাব চুকিয়ে এয়ারটারমিনাসে উপস্থিত হয়েছি। ৯টার সময় A B Aএর একটি বড় বিমানে করে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম।

কয়েক ঘণ্টা পরে গোটেনবুর্গের (Gothenburg) ভূমি স্পর্শ করে বিমান আবার আকাশে উড়ল। আমরা সুইডেন পেরিয়ে ডেনমার্কের ছোট ছোট দ্বীপগুলির উপর এলাম। ডেনমার্কের সুবিস্তৃত খণ্ড খণ্ড ভূ-ভাগের আঁকা-বাঁকা ভাঙ্গা তীরগুলি মানচিত্রের ছবির মতই দেখাচ্ছে।

আমরা ডেনমার্ক ছেড়ে 'নর্থ-সি'র উপর দিয়ে ছুটেছি। দেখতে দেখতে ইংলণ্ডের মাটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিমান নীচে নামতে সুরু করেছে; ইংলণ্ডের দৃশ্য অতি সুস্পষ্ট—এক ছাঁচে গড়া ঢালু ছাদের অসংখ্য সারিবন্দী বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে, চারিদিকে পথ ঘাট মাঠ সবুজক্ষেত উঁচুনীচু জমিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সারা দেশটি যেন সাজানো বাগান।

প্রায় বেলা তিনটার সময় আমরা লণ্ডনের বিমানঘাঁটীতে নামলাম। তারপর কাষ্টম্‌সের কষ্টকর পরীক্ষা পার হয়ে লণ্ডন পৌঁছে Gloucester Road-এ Baileys Hotel-এ গিয়ে উঠলাম।



লণ্ডনের টাওয়ার ব্রীজ

লণ্ডন-ব্রাইটন

লণ্ডনে এবার সাত দিন থাকার কথা। পরদিন শনিবার। সকালেই বেরিয়ে কিছু কাজ সারা গেল; কারণ বেলা ছ'টায় শহরের দোকানপাট আপিস আদালত সব বন্ধ হয়। রবিবার পুরো ছুটি; আমাদেরও কাজ কর্ম কিছু নেই। সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হল। পোর্টারের কাছে খবর নিয়ে জানলাম যে Victoria Station থেকে fast train-এ করে একঘণ্টায় Brighton-এর সমুদ্রতীরে পৌছান যায়।

Brighton-এর সমুদ্রতীর ছুটির দিনে এ দেশের লোকদের আনন্দ উপভোগের একটি বিশেষ স্থান।

সকালের আহার সেরে আমরা ব্রাইটনের সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলাম। পৌঁছে দেখি সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য। একে ছুটির দিন, তায় আবার শীতের শেষ; বাড়ী থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রধারে রোদে বসে দিন কাটাবে বলে। তীরে বালি কম, ছোট ছোট পাথরের নুড়ীতে ভরতি। আমরা তিনটে ডেকচেয়ার ভাড়া করে পেতে বসেছি; খুকু উঠে জলের ধারে বালি নিয়ে খেলতে গেল। সামনেই দেখি বড় বড় মোটর লঞ্চগুলি অনবরত



ব্রাইটন সমুদ্র-সৈকতে

যাত্রী বোঝাই করে সমুদ্রের ভিতর বহুদূর অবধি ঘুরে বেড়িয়ে ফিরছে। খুকু দৌড়ে এল, মোটর-লঞ্চে করে বেড়াতে যেতে হবে। বাড়ী ফেরার

আগে সবাই মিলে মোটরলঞ্চে করে সমুদ্রে বেড়িয়ে এলাম। প্রায় ৫টার সময়ে লণ্ডনে ফিরেছি।

পরদিন ১২ই মে সোমবার। উনি হাসপাতালের কাজে গেলেন। আমরা টিউব্-ট্রেনে করে সহরের বাইরে বেড়াতে গেলাম। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্টেশনগুলির ভিতরে টিকিট কাটার ভিড় কমাবার জন্য কতকগুলি অটোমেটিক মেসিন রয়েছে। মেসিনের শ্লটে পয়সা ফেলে দিলেই টিকিট ও বাকি পয়সা আপনি বেরিয়ে আসে। আমরা ম্যাপে দেখলাম টেম্‌সনদীর নীচে দিয়ে চলেছি।



ব্রাইটনে মোটরলঞ্চে

এই সুড়ঙ্গ রেলপথ-গুলি মাটীর বহু নিম্নে, এমনকি কোথাও আবার একটি ষ্টেশনের নীচে আরেকটি ষ্টেশন রয়েছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের Escalator-এ (চলন্ত সীঁড়িতে) চড়তে খুকু ভীষণ ভালবাসে—সীঁড়ির একটি ধাপে পা দিয়ে দাঁড়ালেই হল—আপনিই উপরে উঠে আসবে।

১টার সময় আমরা বেড়িয়ে ফিরে হোটেলে লাঞ্চ খেলাম ; কি অসম্ভব খারাপ খাবার ! ক্ষিদেয় মরি, অথচ মুখে আহার রোচে না। যুদ্ধের পর এ ব দেশে খাদ্যাভাব খুবই বেশী হয়েছে—মাংস নেই, ডিম নেই ; সব্‌জি তরকারী দুধ চিনি কিছুই মেলে না। গত বছর দারুণ শীতে কয়লার অভাবে এদেশে ভীষণ কষ্ট গিয়াছে, তাই আগামী বছরের শীতের ভাবনা তারা এখন থেকেই ভাবছে ; তার উপর আবার বস্ত্রাভাব।

এ হেন চরম দুর্দশাতেও এ দেশে বাংলার মত দলে দলে নরকঙ্কাল পথে পড়ে মরছে না। সরকারী মহলের সুব্যবস্থায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু

আহার্য পায়—তা' সে যতটুকু যেমনই হোক না কেন। দুঃখে দৈন্যে অভাবে সবাই কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তবুও একে অন্যের গ্রাস কেড়ে খায় না।


চলন্ত সীঁড়ি

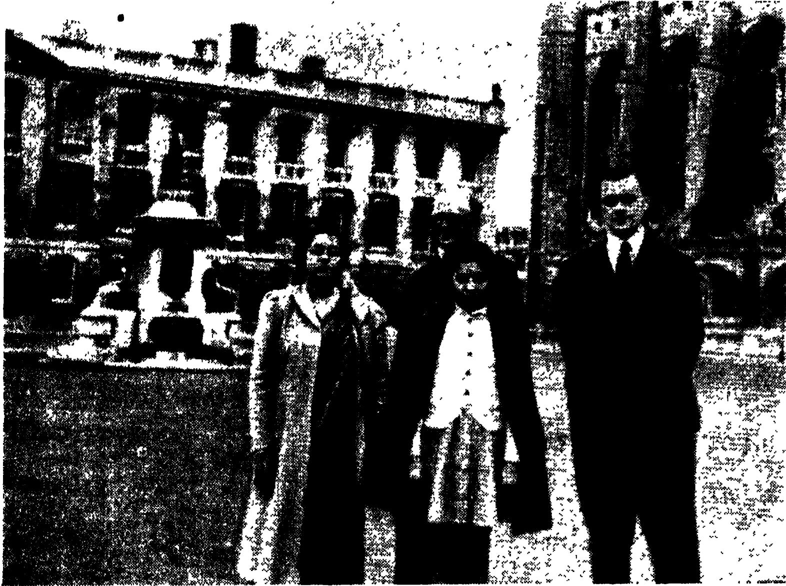
আমরা বিকেলে বেড়িয়ে ৭টার মধ্যে ফিরে চিঠিপত্তর লিখতে বসলাম। এখানে এখন রাত ১২টা অবধি সূর্যের আলো আকাশে থাকে, সে আলোয় তখনও বেশ বই পড়া যায়।

১৩ই মে মঙ্গলবার। আজ সকালে কেম্ব্রিজের Cavendish Laboratory-তে ওঁর "মিলিয়ান ভোল্ট্ এক্সরে মেসিন" দেখতে যাবার কথা, আমরাও সেই সঙ্গে যাব কেম্ব্রিজ বেড়াতে। ফিলিপ কোম্পানীর সৌজন্যেই এ বন্দোবস্ত হয়েছে।

সকালেই বেরিয়ে পড়া গেল। চমৎকার রাস্তা, কোথাও উঁচুতে উঠেছে, কোথাও-বা ঢালুর মত নীচে নেমে গেছে; উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে যেতে ভারি ভালো লাগে। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট ক্ষেত। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে গরু ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। চাষীর বাড়ীর চারিদিক প্রতি আনাচ কানাচটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমরা কেম্ব্রিজে পৌঁছে Cavendish Laboratory-তে গেলাম। সেখানে এক মিলিয়ান, দুই মিলিয়ান ও পঞ্চাশ মিলিয়ান ভোল্টের এক্সরে মসিন তিনটি দেখে বাইরে বেড়াতে বেরোলাম। Prof. Mitchel-এর

তত্ত্বাবধানে এখানে এই এক মিলিয়ান ও তুই মিলিয়ান এক্সরে মেসিনে চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা চলেছে এবং পঞ্চাশ মিলিয়ান ভোল্ট মেসিনটি ব্যবহৃত হচ্ছে আনবিক গবেষণার কাজে।



কেম্ব্রিজের পথে

রাস্তার ওধারে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের কলেজগুলি রয়েছে, পাশেই রয়েছে একটি বিরাট গির্জা। তখন প্রার্থনার সময়। ছেলেমেয়েরা সরু গলায় প্রার্থনার গান গাইছে, দূর থেকে সে সুর ভেসে আসছে।

আমরা মাঠে বেড়াচ্ছি; উনি গেলেন প্রফেসর মিচেলের (Prof. Mitchel) সাথে দেখা করতে। এমন নীরব স্থানটিতে শিক্ষা ও গবেষণার আবহাওয়ায় বেশ সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

কতকগুলি কলেজ লইয়া এই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয় গঠিত; তার মধ্যে ট্রিনিটি কলেজ ও কিংস্ কলেজই বিশ্ববিশ্রুত।

কিছুক্ষণ পরে উনি ফিরে এসে হেসে বল্লেন যে প্রফেসারটি বড় ভালো মানুষ। এ হেন আবহাওয়ায় জীবন কাটিয়ে বাইরের বিশ্বজগতকে একেবারে ভুলে গেছেন, নিজেকেও কাজের ভিতরে হারিয়ে ফেলেছেন। ওঁর উপস্থিতিতে প্রফেসার তো খুব খুশী; স্থানকাল ভুলে জীবনের সমুদয় গবেষণার তালিকা

নিয়ে ওঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। সময় বড় কম, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তায় আবার আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি, সুতরাং উনি তো ব্যস্ত



কিঙস্ কলেজ (কেম্ব্রিজ)

হয়ে উঠলেন। যাহোক কোনও রকমে শেষে কাজ সেরে ফিরে এলেন। আমরা লণ্ডনের দিকে রওনা হলাম। প্রায় ১০০ মাইল মোটরে বেড়িয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম।

লণ্ডন শহরের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটছে। শহরের বাইরে ছোট ছোট বাড়ীগুলি ছবির মত দেখতে। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট্ট একটু সবুজ মাঠ, পিছনে একটু জমিতে তরকারির বাগান।

এদেশের সাধারণ লোকেরাও কর্মে খুব তৎপর এবং শিক্ষিত। এদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। প্রায় সব লোকই দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোক কাজের শেষে underground station থেকে বেরিয়ে আসে হাতে একটি কাগজ নিয়ে। দিনে বহুবার কাগজ ছেপে বেরোতে দেখা যায়।

আমরা একদিন ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবির ভিতরে দেখতে গেলাম। হাউস অফ পার্লামেণ্ট সংলগ্ন এই গির্জাটি একটি বড় প্রাসাদ বিশেষ। গির্জার ভিতরে বিশ্ববিশ্রুত ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইংরাজ সম্রাটদের বড় বড়



লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবি

তৈলচিত্র রয়েছে এবং তাঁদের সমাধির উপরে মূর্তি স্থাপিত। বহু বিশিষ্ট নাগরিক, যোদ্ধা, সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের সমাধি রয়েছে। হলের চারিদিকে দেওয়ালের গায়ে স্মৃতিস্বরূপ বহু সম্মানীয় ব্যক্তির মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

১৬ই মে। আমরা সকালে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম Pan American Air অফিসে। সেখানকার কাজ সারা হ'লে টমাস কুকের অফিস হয়ে টিউব ট্রেনে করে হোটেলের দিকে ফিরছি। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে

ট্রেন তীরের মত ছুটে চলেছে। গাড়ী ভর্তি যাত্রী, স্থানাভাবে অর্ধেক লোক দাঁড়িয়েই চলেছে। হঠাৎ মাঝপথে ট্রেন থামল। 'কি হল' বলে যাত্রীরা সব ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে দেখি মিস্ত্রীরা সব যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে কামরার ভিতর দিয়ে ছুটাছুটি করছে। বুঝলাম, ইঞ্জিনের কল বিগড়েছে। আধঘণ্টা এইভাবে কাটল, ট্রেন আর নড়ে না। ঘেমে মরি, চোখ জ্বালা করছে, গরমে ও পরিষ্কার বাতাসের অভাবে প্রাণ যায়—যেন ইঁদুরকলে পড়েছি! গাড়ীর ভিতর আবার কোথা থেকে ধোঁয়া আসতে আরম্ভ করল; সবাই ভয়ে অস্থির—বুঝি এইখানেই আজ ভবলীলা সাঙ্গ হয়!



ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবির সম্মুখে ডাঃ ঘোষ ও আমরা

একটু পরে একজন রেল কর্মচারী এসে বল্লে,—"আপনারা গাড়ীর কামরাগুলির ভিতর দিয়ে বরাবর হেঁটে চলে যান, ষ্টেশন অবধি পরপর ট্রেণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।" শুন্‌বামাত্র উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কামরার পর কামরা পেরিয়ে চলেছি। ইঞ্জিনের উত্তপ্ত কলকব্জার মাঝে সরু পথ দিয়ে হেঁটে যেতে খুবই কষ্ট হতেছে। আমি খুকুর হাত চেপে ধরে কোনরকম করে কামরা পার হয়ে চলেছি। প্রায় দেড় মাইল ট্রেনের ভিতরে হেঁটে South Kensington Station-এ নেমে দাঁড়ালাম। বাইরে এসেই মাথা ঘুরে উঠলো। দু'তিন জন মহিলা তখনই ষ্টেশনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমি ও খুকু একটু সেইখানে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিলাম, তারপর রাস্তায় উঠে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। আধঘণ্টা বিশ্রাম করে উনি রয়েল সোসাইটি অফ মেডিসিনে ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চলে গেলেন।

১৭ই মে শনিবার। আজ আমাদের আমেরিকা যাত্রার দিন। সকালে উঠে খাওয়া শেষ করে দু'একটি জিনিষ কিনবার জন্য বেরোচ্ছি, এমন সময় রয়টারের একজন রিপোর্টার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায়

কথায় তিনি হঠাৎ দরদী হয়ে বল্লেন যে, বিদেশে ভারতের খবর খুব কমই পাঠানো হয়, অর্থাৎ মোটেই ভালো প্রপাগাণ্ডা করা হয় না। এই সেদিন ভারতে এত বড় দুর্ভিক্ষ গেল, কিন্তু ভারত থেকে তার খবর বিশদভাবে কোথাও গেল না, পৃথিবীর কেউ তা জানতেই পারল না। জার্মানীতে সেদিন এই কয়েকটামাত্র লোক খেতে পায়নি, কিন্তু তারা পৃথিবীময় সে খবর ফলাও করে রটিয়েছে। ফলে, হয় তো আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্যও মিলবে। এমন দরদী কথা শুনলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় বটে; কিন্তু খবর দেবার মালিক যে কে এবং কেন যে ভারতের খবর বাইরে যায় না তা আমাদের কোনোপক্ষেরই তো অজানা ছিল না। কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ নেই মনে করে এ সকল কথার উত্তর না দিয়ে উনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। কাজ সারা হলে আমরা বাইরে বেড়াতে বেরোলাম।

বেলা প্রায় ৬টায় আমরা বিমানঘাঁটীতে উপস্থিত হয়েছি। আকাশে কালো মেঘ জমেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়াও সুরু হল। আমরা বিমান-ঘাঁটীর মাঠে গিয়ে Pan American Air-line-এর একটি বড় বিমানে উঠে পড়লাম। পঞ্চান্ন জন আরোহী নিয়ে বিমানখানি আকাশে উড়ল। তার মধ্যে ৪২জন বিদেশ যাত্রী, ৯জন চালক এবং ৪জন ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্ডেশ। আমরা তিনজন মাত্র বাঙ্গালী, আর সবাই ইউরোপীয়ান।

আকাশের আবহাওয়া খারাপ, বায়ু প্রতিকূলগামী। বিমান ইংলণ্ড পার হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আয়ার্লণ্ডের Shanon-এ ধীরে ধীরে নামল। এখানে আহারাদি শেষ করে আবার আকাশ পথে উড়ে চলেছি। সামনেই আটলাণ্টিক মহাসাগর—উন্মত্ত জলরাশি ফুলে উঠে পাড় ভেঙ্গে ফেনা ছড়িয়ে চলেছে। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে সীমাহীন নীলাম্বুরাশি। আমরা শূন্যে কোন এক নীল পরীর রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছুটেছি। সূর্য অস্ত প্রায়।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল, দূরে বহুদূরে আরো উপরে বিমান উড়ে চলল। পৃথিবীর ছবি চোখের সামনে মিলিয়ে এল। দূর থেকে দেখি সাগরের নীল জলে ভাসমান ফেনিল তরঙ্গমালা শুধু বিন্দু বিন্দু ফেনার ফোঁটার মত ভাসছে। চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। বিমানে জোর আলো জ্বলছে। আমি বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম।

ক্রমে রাত গভীর হল, যাত্রীরা সব একে একে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিই একা জেগে বসে আছি, ঘুম আর আসে না। জানলা দিয়ে দেখি—অন্ধকারের মাঝে বিমানের দু'দিকে দুটি ডানায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে আর নিভছে। হঠাৎ বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুয়ার্ডেশ এসে হাজির। যাত্রীরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে কাউকে আর না জাগিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। বিমানে সঘন দোলা সুরু হল, আমি ভয়ে অস্থির। ঘুর্ণিবায়ুর ঘুরপাকে পড়ে বিমান থরথর করে কেঁপে ওঠে। দেখতে দেখতে ঝোড়ো হাওয়ার স্তর নীচে ফেলে রেখে আমরা আরো উপরে উঠে পড়লাম। সারা রাত মহাসাগরের উপর এমনি করে কাটল।

প্রায় ৪টের সময় অন্ধকারের মাঝে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের Gander-এ বিমান ধীরে ধীরে নামলো। আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি প্রচণ্ড শীত; যথেষ্ট গরম কাপড় পরেছি, উপরে ওভার কোটও চাপিয়েছি কিন্তু তবুও শীতে বাইরে থাকা দায়!

বিমানঘাঁটীর গরম করা ঘরে বসে আরামে প্রাতরাশ সেরে বড় কাঁচের জানলার ধারে এসে দাঁড়ালাম। সবে তখন উষার আলো আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে। লাউডস্পীকারের নির্দেশ মত আবার আমরা ফিরে গিয়ে বিমানে উঠলাম।

আকাশ পথে চলেছি। নীচে সারা মাঠে কর্পূরধবল তুষার ছড়ানো, নদী ও জলাশয়গুলি জমে চকচক্ করছে, গাছের ঝোপ ঝাড় বরফের ভারে নুয়ে পড়েছে। খুকু তো বরফ দেখে ভারি খুশী। তার ইচ্ছে ছিল সেই ভূগোলে পড়া বরফে ঢাকা এস্কিমোল্যাণ্ডটা একবার সচক্ষে দেখে আসে; কিন্তু এবার আর তা হ'লো না। বেলা বাড়তে লাগল, আমরা নীল চশমা এঁটে পরদা টেনে বসে রইলাম। ষ্টুয়ার্ড এসে জানিয়ে গেল বেলা প্রায় ১০॥টায় নিউইয়র্ক পৌঁছাব।

বিমান তীরবেগে ছুটেছে। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে কুয়াশা এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। চারিদিক ভীষণ ঘন কুয়াশায় ভরে গেল, বিমানের ডানা দু'টি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না,—আমরা যেন কুয়াশার জালে জড়িয়ে পড়ে আর বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। শাদা ধোঁয়ার উপর সূর্যের আলো

পড়ে চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে—কোনদিকে আর চাওয়া যায় না। ১টা বেজে গেল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই; কুয়াশার পথ আর ফুরোয় না। হঠাৎ বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠল। মনে মনে খুবই আনন্দ হল—এইবার যাহোক আমরা আমেরিকার মাটীতে নামব। বিমান সেই ধোঁয়ার ভিতরে নীচের দিকে নেমেই চলেছে। হঠাৎ অনুভব করলাম—বিমানখানা এক ধাক্কায় মুখ উপরে তুলে নিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই সজোরে টান দিয়ে পাখীর মত সোঁ করে বহু উপরে উঠে এল। 'একি!' 'একি!' বলে যাত্রীরা সব হৈ চৈ করে উঠল। ষ্টুয়ার্ডদের কাছে কিন্তু কোন খবরই মিলল না। নিরুপায় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি করে কাটিয়ে চলেছি। মন মেজাজের সঙ্গে দেহের অস্বোয়াস্তিরও অবধি নেই। এমন সময় খেয়াল হল একবার ইঞ্জিনের ঘরটা দেখে এলে হয়। আমাদের অনুরোধে ষ্টুয়ার্ডেশ চালকের অনুমতি নিয়ে এল। আমরা এক একজন করে ইঞ্জিনের ঘরে ঢুকে দেখলাম। বিমানের সামনে ছোট্ট একটি কাঁচের ঘর, কত রকমের কালো কালো কলকব্জায় ভরা, সেগুলি ঘিরে মধ্যভাগে বসে আছে পাইলট, তারপর প্রথম অফিসার, দ্বিতীয় অফিসার করে ক্রমপর্যায়ে আটজন চালক বসে মাথায় 'হেড্ ফোন' এঁটে ক্রমাগত যন্ত্রপাতি নাড়ছে,—একমনে তারা যে যার কাজ করে চলেছে, কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটু পরে ষ্টুয়ার্ড খবর দিল যে ভীষণ কুয়াশার জন্য নিউইয়র্কে নামা গেল না, শীঘ্রই আমরা ওয়াশিংটনে নামব। প্রায় ৩টের সময় আমাদের বিমান ওয়াশিংটনের উপর এল। আকাশ পরিষ্কার পেয়ে বিমান নামতে সুরু করেছে। আমরা আমেরিকার মাটীর উপর এই প্রথম এসে দাঁড়ালাম।



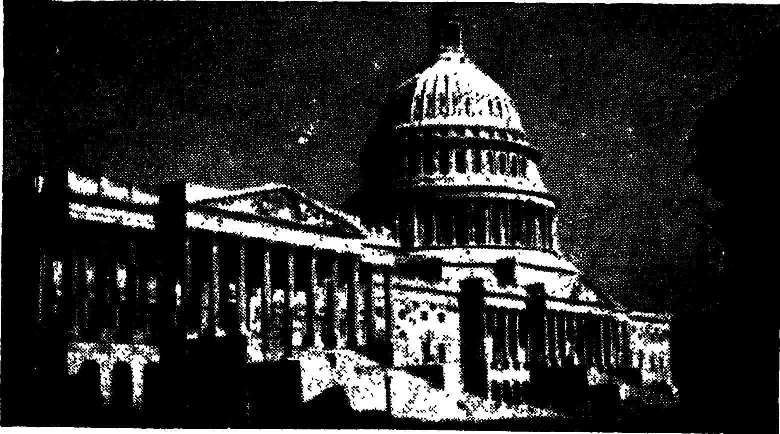
মুক্তি প্রতিমা (নিউইয়র্ক)

পাঁচ

আমেরিকা

বিমানঘাঁটির ঘরের ভিতর ঢুকতেই স্বাস্থ্যবিভাগের একজন ডাক্তার এসে সকলের মুখে একটি করে থার্মোমিটার পুরে দিলেন—এই হল স্বাস্থ্যপরীক্ষা। তারপর গেলাম কাষ্টম অফিসে; শেষে পাসপোর্ট্ দেখিয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনকানুনের হিসাব চুকিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। এতক্ষণে এক পেয়ালা গরম কফি ও একখানা মিঠা-পিঠা (কেক) খেয়ে প্রাণ বাঁচল। যাত্রীদের কাজ সারা হ'লে limousine-এ করে শহরের ষ্টেশনে সোজা নিয়ে আসা হল। সামনেই দেখা যাচ্ছে Capitol Hall —শাদা ধবধবে গম্বুজওয়ালা বিরাট একটি অট্টালিকা।

ওয়াশিংটন থেকে ট্রেণে নিউইয়র্কের দিকে রওনা হয়েছি, ষ্টুয়ার্ড্ ও ষ্টুয়ার্ডেশরাও সঙ্গে আছে। বিমান কোম্পানীই এ সকল খরচা বহন



ওয়াশিংটন ক্যাপিটল

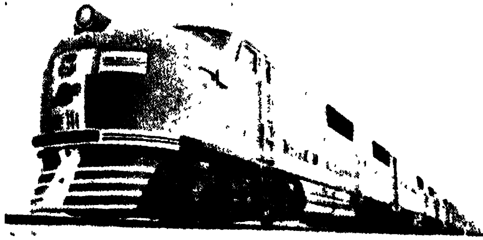
করবে। বিকেল ৬টায় ট্রেনের ডাইনিংকারে খেতে বসলাম। শরীর ক্লান্তিতে ভরা, কিছুই ভালো লাগছে না। সেই সকাল ৮টায় বিমানে ব্রেকফাষ্ট খাবার পর এখন অবধি আহার্য কিছুই মেলেনি। খাওয়া সেরে

পুলম্যন (pullman) কামরায় গিয়ে সোফায় বসা গেল। একজন আমেরিকা-বাসী বিমান-সহযাত্রীর সাথে আলাপ হ'ল, ভদ্রলোকটি সারাপথ গল্প করে চলেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম—আজকে আমাদের এই বিমানে বেশ একটু বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। যাত্রীদের সে সকল অবস্থা বলা বারণ বলে ষ্টুয়ার্ডরা আমাদের তখন কিছু বলেনি। বিমানঘাঁটির উপর অনবরত চক্রাকারে বিমান ঘুরেছে কিন্তু কিছুতেই নামতে পারেনি। যতবার নীচে নামে ততবার কুয়াশার মধ্যে কিছু দেখতে না পেয়ে বিমানঘাঁটির উল্টো পথে প্রবেশ করে ফেলে; ভুল পথে এসেছে জানবামাত্র তৎক্ষণাৎ আবার উপরে উঠে আসতে বাধ্য হয়। এমনি করে Baltimore, Philadelphia ও Boston এবং কাছাকাছি আরো অনেকগুলি সহরের বিমানঘাঁটিতে নামতে চেষ্টা করে, কিন্তু কুয়াশার মাঝে ঠিক পথ দেখতে না পেয়ে কোথাও ভূমিস্পর্শ করতে পারেনি। এইভাবে সারাবেলা আকাশে কাটিয়ে শেষে বেতার মারফৎ খবর পায় যে Washington-এ আকাশ পরিষ্কার; সুতরাং শেষ অবধি সেইখানেই গিয়ে বিমানঘাঁটিতে নামতে সক্ষম হয়। শুনলাম, একবার নাকি এইভাবে একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। নিউইয়র্কে ১০২ তলা উঁচু Empire State Building এমনি একদিন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। একটি বিমান এই গগনস্পর্শী অট্টালিকায় সজোরে ধাক্কা দিয়ে ৭৫ তলার ভিতরে ঢুকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, বহু লোক তাতে প্রাণ হারায়।

আমরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলাম যে, নিউইয়র্ক পৌছতে আমাদের তিন ঘণ্টা দেরী হবে। কারণ, আকাশ-ভরা হালকা কুয়াশার আভাস বহুদূর হতেই দেখা গিয়েছিল। তারপর এই ঘন কুয়াশার জালে পড়ে আকাশে অনবরত ঘুরতে ঘুরতে আরও দু'ঘণ্টা নামতে দেরী হয়ে গেল। পেট্রোল কম পড়লে যে কি হত, তা ভাবলেও ভয় করে। যা হোক, সব বিপদ কাটিয়ে আমরা নিরাপদে মাটীতে নেমেছি। ভাগ্যের জোরে মানুষ এমনি করেই বাঁচে।

খুকু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেল। ট্রেনের কামরাগুলি এয়ারটাইট, ভিতরে শব্দ ও ধূলাবালির বালাই নেই। পুলম্যনের কামরায় কার্পেটের উপর সোফা কৌচ পাতা—সাজানো গোছানো ঝকঝকে। ইলেকট্রিক ট্রেন বিদ্যুৎবেগে ছুটেছে। আমরা আমেরিকার বাড়ী ঘর মাঠ পথ দেখতে দেখতে চলেছি; রাত প্রায় ৯টার সময় নিউইয়র্ক পৌছলাম।

এদেশে ট্রেনের সকল রকম কাজকর্ম নিগ্রো জাতির উপরই ন্যস্ত। ষ্টেশনে নেমে দেখি ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন মহিলাকর্মী আমাদের নিতে এসেছেন। আমাদের মালপত্তর গাড়ী থেকে নামানো মায় ট্যাক্সি ঠিক করা পর্যন্ত সকল ব্যবস্থা তিনিই করে দিলেন। নতুন জায়গার নিয়মকানুন জানা নেই; সুতরাং সারাদিনের ক্লান্তির পর এই সাহায্যটুকু আমাদের খুবই উপকারে লাগল। ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের মহিলাটি বল্লেন, আজ সকাল থেকে সারাদিন ধরে তাঁরা আমাদের বিমানের খোঁজেই কাটিয়েছেন, কিন্তু বিমানের খবর কোথাও সঠিক মেলেনি। শেষে বিমান নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আকাশে বিমানের গতিবিধি কোথায় কি রকম ঘটছে, কেউ তা বলতে পারে না, চারিদিকে টেলিফোন আর ছুটাছুটি করে সন্ধ্যার দিকে তাঁরা খবর পেলেন যে, বিমান ওয়াশিংটনে নেমেছে এবং যাত্রীরা সব ট্রেনে করে নিউ-ইয়র্কে আসছে। আমাদের জন্য তাঁরা এত কষ্ট করেছেন শুনে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম।

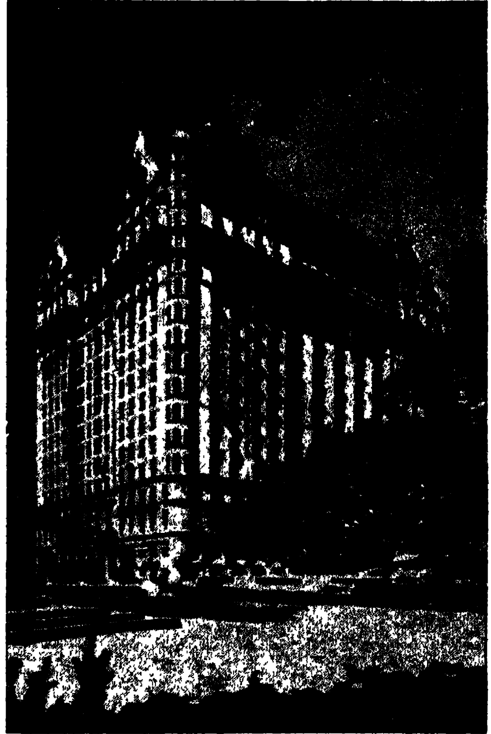


আমেরিকার ষ্ট্রীমলাইন ট্রেন

ছয়

নিউইয়র্ক

রাজপথের দু'ধারে সাজানো বড় বড় দোকান দেখতে দেখতে চলেছি। চারিদিক আলোয় আলোকিত, বিজ্ঞাপনের রকমারি কায়দা, বড় বড় ফ্লাড লাইট আর neon আলোয় রাস্তা জ্বলজ্বল করছে--রাতকে দিন করে ফেলেছে। Fifth Avenue-তে Hotel Plaza-র সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ষ্টেট্ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই হোটেলে আমাদের জন্য ঘর রিজার্ভ করা আছে। তাঁরা আবার খবরও দিয়ে রেখেছিলেন যে, আমাদের আসতে দেরী হবে। শুনলাম, এখানকার নিয়ম নাকি ৬টার ভিতর ঘর দখল না করলে বা খবর দিয়ে না রাখলে, রিজার্ভ বাতিল হয়ে যায়। যাহোক, আমাদের আর সে সকল হাঙ্গামায় পড়তে হয় নি।



হোটেল প্ল্যাজা

সাত তলায় দুটো ঘর আমাদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। ঘরে গিয়ে দেখি, ভিতরে জমকালো রকমের সাজানো ; এত বিলাসিতার প্রাচুর্য আর কোথাও দেখিনি। এক একটি ঘরে অন্ততঃ পনের ষোলটা করে আলো জ্বলছে।

পথশ্রমে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সুতরাং বাক্সগুলি ছোট একটি Box room-এ রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ১৮ই মে। চোখ খুলে দেখি আমরা আমেরিকায়। মনে ঔৎসুক্যের অবধি নাই—আমেরিকা দেখব! তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেলের একদিকে 5th Avenue, অন্যদিকে 57th Street, আর সামানেই Central Park। হোটেলটি মাত্র বিশ তলা উঁচু। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলির পাশে হোটেলটি খুবই ছোট দেখাচ্ছে। এখানকার বিশ্ববিখ্যাত Sky-scraper-গুলি পঞ্চাশ, ষাট তলা করে উঁচু। নিউইয়র্কের এই Manhattan দ্বীপটি হল নূতন আধুনিক শহর। এখানকার Fifth Avenue রাস্তাটি বড় বড় দোকানের জন্য বিখ্যাত। প্রগতিশীল সমাজের নিত্য নূতন আধুনিক রুচির সাজ-সরঞ্জামে দোকানগুলি সাজানো। এককথায়, Fifth Avenue হল ফ্যাসানের রাজা।



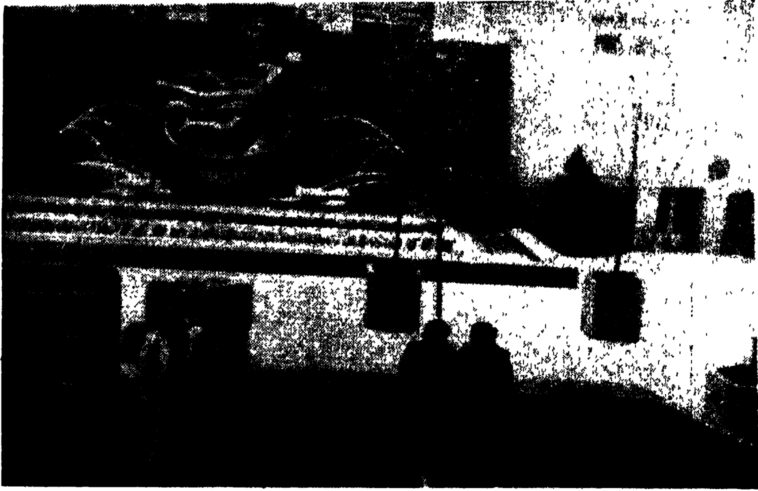
রকেফেলার সেণ্টারের প্রবেশপথে

আমরা প্রথমে ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে আমাদের তত্ত্বাবধায়িকাকে (Miss Mann) তুলে নিয়ে Rockefeller Centre দেখতে গেলাম।

এদেশে চলতি কথায় ট্যাক্সিকে 'Cab', ট্রামকে 'Street car' ও Lift-কে 'Elevator' বলা হয়।

Rockefeller Centre-এ Radio City Building-টি সত্তর তলা উঁচু। আমরা Elevator-এ করে সত্তর তলার Obsevatory Roof-এ

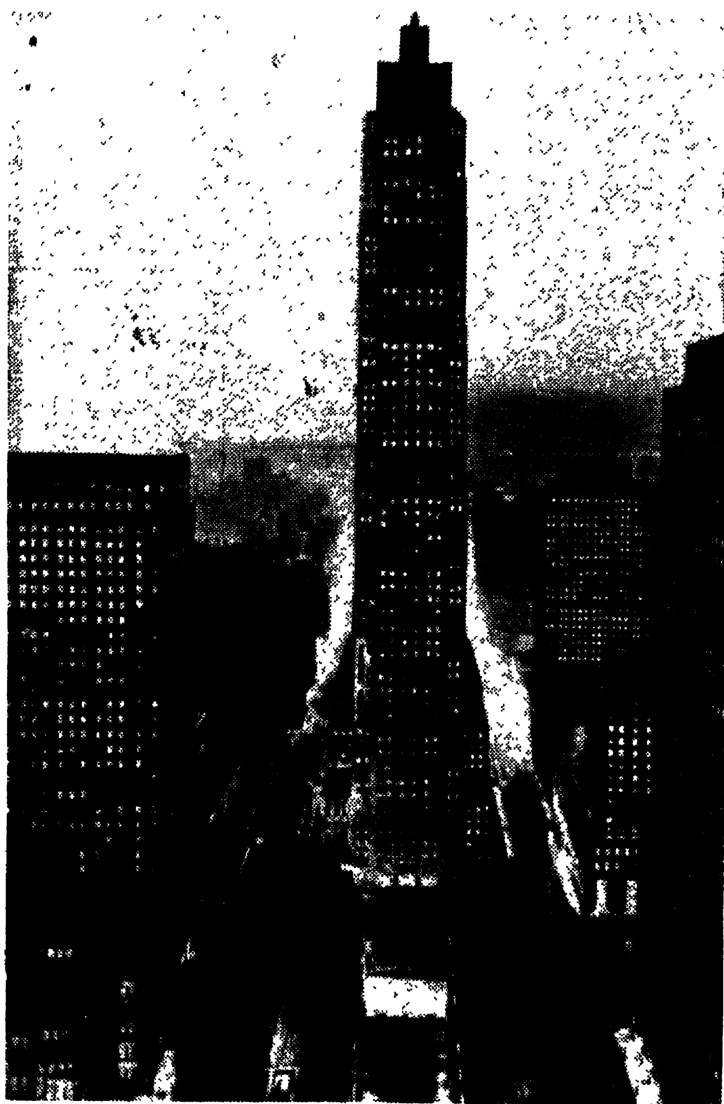
উঠলাম। এখান থেকে শহরের দৃশ্য অতি চমৎকার। তিনটি ব্লক জুড়ে Rockefeller Centre; এই Centre-এ নেই এমন জিনিষ আমেরিকাতে নেই। সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট থেকে আরম্ভ করে সার্বজনীন বাণিজ্যকেন্দ্র, ব্যবসায়ীদের বড় বড় অফিস, বেতার ষ্টেশন ইত্যাদি সবই রয়েছে, প্রায় ত্ব'মাইল ব্যাপী বড় বড় দোকান রয়েছে;—একে বলা হয়—A city within a city (শহরের মধ্যে শহর)! Rockefeller Centre-এ Radio City Music Hall পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়



রকেফেলার সেন্টারের প্রবেশপথে

প্রেক্ষাগৃহ—ছয় হাজার লোকের বসবার আসন এখানে রয়েছে আমরা শহরের আরো খানিকটা বেড়িয়ে Cab-এ করে হোটেলে ফিরলাম।

এখানকার একদিকের রাস্তাগুলিকে (উত্তর হতে দক্ষিণে) নম্বর দিয়ে 'ষ্ট্রীট' বলা হয়; আর অপর-দিকের রাস্তাগুলি (পূব হতে পশ্চিম) Avenue নামে পরিচিত, সেও নম্বর দিয়ে। রাস্তার নাম নেই। শহরের মাঝ দিয়ে চওড়া একটি বাঁকা রাস্তা চলে গেছে—নাম Broadway। এই Broadway রাস্তাটি সাজানো দোকান পাটে ও বিজ্ঞাপনের আলোয় ভর্তি; দিনরাত সমানভাবেই এখানে আলো জ্বলছে। এ রাস্তায় কোন সময়ই লোকের ভীড় কম হয় না।



রাতের আলোয় রকেফেলার সেণ্টার

আমরা বিকেলে Radio City Music Hall-এ সিনেমা দেখতে গেলাম। হল্‌টি বিরাট, মহামূল্যবান আসবাব ও কারপেট দিয়ে সাজানো; বড় বড় রঙিন ঝাড়ের আলোয় চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রকাণ্ড একটি অর্গান কি মধুর সুরে ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ৪০টি এক ছাঁচে গড়া মেয়ে ষ্টেজে এসে নাচতে লাগলো। এমন সুসঙ্গতভাবে এক তালে এক ঢঙে নাচল যে, পাশ থেকে দেখাচ্ছিল যেন একটি মেয়ে নাচছে। তারপর আরো ২।৩টা খেলা-ধূলা ও ব্যালেন্সের কায়দা দেখানোর পর সিনেমার পরদা উঠল। এতো বড় হলে এমন সুন্দর accoustics-এর ব্যবস্থা রয়েছে যে, সব জায়গা থেকে অতি মৃদু আওয়াজও সুস্পষ্ট শোনা যায়।

সিনেমা শেষ হ'লে হেঁটে ফিরছি। রাস্তায় কয়েকটি মাতালকে টল্‌তে দেখে খুকু ভয়ে অস্থির, শেষে সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতে হল।



R. C. A বিল্ডিংএর ছাদ থেকে নিউইয়র্ক শহরের দৃশ্য

পরদিন ২০শে মে। সকালে উনি গেলেন হাসপাতাল দেখতে; আমি ও খুকু প্রাতরাশ সেরে রাস্তায় একটু হাঁটতে বেরোলাম। রাস্তায় এসে দেখি, নানা দেশের নানারকম চেহারার নানাজাতের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—শাদা, কালো, চেপ্টামুখ, উঁচুমুখ, বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা ইত্যাদি সব রকমের। 'সকল দেশের মানুষ নিয়েই এই আমেরিকান জাতির সৃষ্টি। 'আমেরিকা' বল্লেই আমাদের মনে হয়—এক স্বর্গরাজ্য—প্রচুর ধনদৌলত ও ঐশ্বর্যেভরা

ধনীর আবাসভূমি। সত্যিই এখানকার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে চোখ ঝলসে যায়—মানুষের তৈরী কৃত্রিম জিনিষের সম্ভারে দেশটা ভরতি! পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হল এই আমেরিকা।

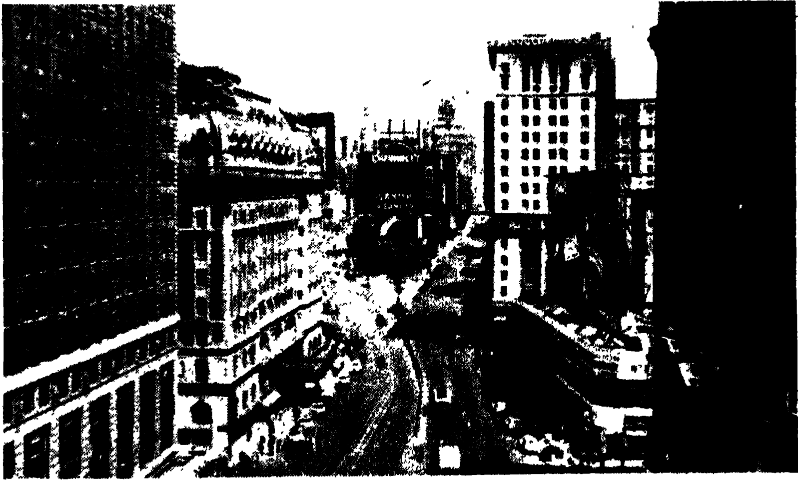
এই নূতন জাতিটির উৎপত্তি বেশ একটু নতুন ধরণের। কথায় বলে—"From log-cabin to sky-scrapers."। আমেরিকা আবিষ্কৃত হবার পর দেশ-বিদেশের বাস্তুহারা লোক এসে এখানে বাসা বাঁধলো; তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল ইউরোপের দরিদ্র সমাজের নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত লোক। নিজেদের দেশে সুযোগ সুবিধার অভাবে নিরাশ ও ব্যর্থ জীবন যাপন না করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন দেশে, নতুন জীবনে নতুন আশা নিয়ে; আমেরিকায় এসে যেন তাদের নবজন্ম হ'ল। তাদের স্বপ্ন ও সাধনা হল নতুন আদর্শে এক অভিনব দেশ গড়ে তোলা,—যেখানে মানুষ সকল সুযোগ ও অধিকার লাভ করে গড়ে তুলবে এক নতুন আদর্শ জাতি,—বিশ্বের মাঝে যারা অধিকার করবে শীর্ষস্থান। আজ এরাই হল বিশ্বযুদ্ধে রণজয়ী বীর, পৃথিবীর রাষ্ট্র নেতা, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, বরেণ্য বৈজ্ঞানিক ও কোটিপতি মালিক।

শাদা আমেরিকান ছাড়া আরেকটি ভিন্ন জাতির মানুষকে এখানে দেখতে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে নিগ্রোজাতি। বহুকাল পূর্বে আফ্রিকা হতে ক্রীত-দাসরূপে এদের ধরে আনা হয়; আজ তারা সংখ্যায় অনেক। এরা দীর্ঘকাল ধরে দাসত্বের আইনে আবদ্ধ থেকে নির্যাতিত জীবন যাপন করেছে। তারপর সে আইন হতে মুক্ত হয়ে নাগরিকের অধিকার লাভ করে। আমেরিকার দক্ষিণে তুলা ও তামাকের চাষে এই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন বেশী; তাই উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণের মালিকরাই এদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন বেশী দিন। উদারপন্থী উত্তর বাসিন্দারা দাসত্বের আইনের বিরোধিতা করেন। এই সময় Illinois থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এলেন Abraham Lincoln। তিনি দাসত্ব-মোচনের পক্ষে তীব্র আন্দোলন সুরু করলেন। ১৮৬০ সালে তিনি President নির্বাচিত হন। সেই সময় আবার সারা দেশে গৃহ-বিবাদের আগুন জ্বলে উঠে। ১৮৬৫ সালে President Lincoln-এর নেতৃত্বেই আমেরিকা দাসত্বের কলঙ্ক হতে মুক্ত হয়। এরপর থেকে আমেরিকায় এল সুদিন,—জাতির আদর্শপথ উন্মুক্ত হল, ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে দেশ

এগিয়ে চলল, মরুভূমি শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল ; সারা বিশ্ব হ'তে দলে দলে লোক এসে বসবাস করতে লাগল এই দেশে। আজও আমেরিকার উত্তরে Republican Party এবং দক্ষিণে Democratic Party স্ব, স্ব দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও একত্র হয়ে দেশের কার্যে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করছে।

উদারচেতা মহামানব লিন্‌কনের নামে আজও দেশবাসী সবাই মাথা নত করে।

রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছি ; দেখি, পথের ধারে দু'সারি লোক নানারকম সেজেগুজে চলেছে। মেয়েরা পরেছে মোটা মোটা দৃষ্টি-আকর্ষণী গহনা,



নিউইয়র্ক শহরের রাজপথের দৃশ্য

জমকালো রঙের পোষাক ও রংবেরং-এর রকমারি আকারের টুপী—যেন রাস্তাভরা বহুরূপী। আমরা বেড়িয়ে ১টার সময় হোটেলে ফিরলাম। লিফ্‌ট্‌ম্যান আমাদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল যে, সে ভারতবর্ষে গিয়েছিল, কোলকাতা দেখেছে, সেখানকার ব্যারাকপুর, "ক্যচড়েপ্যাড়া" ও কার্পো সবই জানে ; সুতরাং ভারতবর্ষের বিষয়ে মস্ত authority। এখানকার যত লিফ্‌ট্‌ম্যান, পোর্টার, দোকানদার, ট্যাক্সি-চালক ইত্যাদি helper শ্রেণীর লোক আছে, সবাই তারা এই মহাযুদ্ধে সৈনিকের কাজে

নেমে পড়েছিল। যুদ্ধের সময়কার কলিকাতার দৃশ্য তখন আমার মনে পড়লো—যখন এই সব বীর যোদ্ধার দল শহরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াত, আর শহরবাসীদের করে তুলেছিল একেবারে অতিষ্ঠ।

আজ বিকেলে রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দের সঙ্গে দেখা করতে. গেলাম। স্বামিজী সতের বৎসর এইখানে আছেন, বড় ভালো মানুষ। সেখানে কয়েকজন আমেরিকান ভক্তের সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল। তাঁরা খুব যত্ন করে আমাদের চা খাওয়ালেন। একজন বর্ষীয়সী মহিলা (Mrs. Davidson) মোটর চালিয়ে আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। পথে Empire State Building দেখলাম—আমেরিকার Sky-scraper অট্টালিকাগুলির মধ্যে এই বাড়ীটিই হ'ল সবচেয়ে উঁচু—১০২ তলা।



এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং (১০২ তলা)
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী

Manhattan দ্বীপে, নদীর ধারে, চওড়া বাঁধান রাস্তাগুলিতে বেড়াতে আমাদের খুব ভালো লাগছিল। হাড্সান, ইষ্ট ও হারলেম নদীগুলি এই দ্বীপটিকে ঘিরে রয়েছে। Speedway রাস্তাটি অতি সুন্দর। থাকে থাকে সাজান রাস্তাগুলি নদীর ধারে একটার পর একটা সিঁড়ির মত উপরে উঠে গেছে। অসংখ্য মোটর গাড়ী এক রাস্তায় চলছে, ফিরছে অন্য রাস্তায়। বিনা বাধায় গাড়ী ছুটছে, দুর্ঘটনার ভয় নেই।

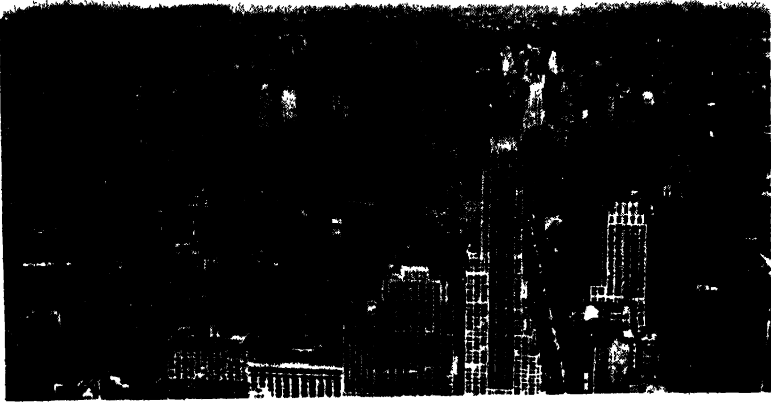
আমি Mrs. Davidson-এর সাথে গল্প করছি; কথায় কথায় হাসপাতালের কথা উঠতে তিনি বল্লেন যে, সব দেশের মত নার্স-সমস্যা এখানেও বড় জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুনলাম, এখানে নার্সদের শিক্ষার দু'রকম ব্যবস্থা রয়েছে,—প্রথম শ্রেণীর নার্সদের সমস্ত কিছু শিক্ষার সাথে ডাক্তারী বিদ্যাও কিছু শিখতে হয়। হাসপাতালে অপারেশনে সাহায্য করা, এনেস্থেসিয়া দেওয়া ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এরাই করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নার্সরা সেবিকা বিশেষ, রোগ পরিচর্যা করা ও রোগীকে সেবাশুশ্রূষা করাই হ'ল এদের প্রধান কাজ। এরা হাসপাতালেও কাজ করে এবং গৃহস্থের বাড়ীতেও রোগীর সেবা করতে যায়। এদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সম্প্রতি যন্ত্রযুগের কল্যাণে মেয়েরা সব নার্সিং-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকারখানার কাজে ও অফিসে যোগ দিতেছে, যেহেতু সেখানে পয়সা বেশী, খাটুনী কম। ফলে, হাসপাতালে আর নার্স মেলে না।

২১শে মে। আজ দুপুরে রামকৃষ্ণ আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ। Mrs. Dividson বাংলা রান্না রেঁধে খাওয়াবেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় Miss Hilde—আশ্রমের অন্যতমা শিষ্যা—আমাদের সাথে নিয়ে Subway train-এ করে Museum of Natural History দেখাতে নিয়ে গেলেন। এদেশে Subway Train, Tram ও Bus-এ টিকিট কেনার ঝামেলা নেই, নির্দিষ্ট একটি Slot-এ একটি Dime (১০ সেণ্ট) ফেলে দিলেই হ'ল। আমরা Museum-এ এসে প্রথমে আফ্রিকার জীবজন্তু-কক্ষে ঢুকলাম। ঘরের দেওয়ালে কাঁচের শো-কেসে মরা জীবজন্তুগুলি তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবন্তের মত সাজানো রয়েছে। এই দৃশ্যগুলিতে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার চিত্র পরিষ্কার দেখান হয়েছে। পাশে দেয়ালের গায়ে আফ্রিকার ম্যাপ আঁকা ও প্রাণীগুলির জীবনেতিহাস লেখা। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীতে হল্ ভর্তি। আমরা আরও কয়েকটি দেশের জীব জন্তু দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে আশ্রমে গেলাম। আশ্রমে বাংলা রান্না খেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল, তা' বলার নয়।

বিকেলে Mrs. Davidson শহরের অপরদিকটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। এখানকার International House মস্ত বড় বাড়ী, সেখানে প্রায় ২০০ জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী রয়েছে; তার মধ্যে ভারতীয়ও দেখলাম। আধুনিক

শহর পেরিয়ে আমরা প্রাচীন নিউইয়র্কের দিকে এলাম। সরু গলির দু'ধারে ৪০।৫০ তলা বাড়ীগুলি যেন আকাশ ফুঁড়ে বিরাট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার রং কালো, বাড়ীগুলি ধোঁওয়ায় ও ময়লায় একেবারে কালো হয়ে গেছে। এ স্থানে আলো বাতাস প্রবেশের পথ চিরতরে বন্ধ.। তাই দিনরাত অন্ধকার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। কি বিশ্রী জায়গা! গলির ভিতর বেশীক্ষণ থাকলে মাথা ঘুরে ওঠে।

এখান থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা Hudson নদীর নীচে Holland Tunnel-এর ভিতর ঢুকলাম। ভিতরে নদীর স্রোতের গম্‌গম্



নিউইয়র্ক শহরে স্কাই স্ক্রেপারের জঙ্গল

আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় দেড় মাইলব্যাপী টানেল পার হ'য়ে আমরা ওপারে New Jersy State-এর New Jersey city-তে এসে পড়লাম। New Jersey ছোট শহর। নদীর ধারে সবুজ মাঠের মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি ঠিক ছবির মতই দেখতে। সবুজ ঘাসের মাঝে রংবেরং-এর ফুলের বাহার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এপার থেকে ওপারে নিউইয়র্কের skyline বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে মিসেস ডেভিডসান হঠাৎ বলে উঠলেন,—"দেখুন তো ওপারে কেমন জেলখানা তৈরী হয়েছে।" কথাটা শুনে মনে হ'ল তুলনাটা নেহাৎ মন্দ হয় নি। গরাদের মত সরু সরু

উঁচু বাড়ীগুলিতে মানুষ ঠেসে ভরা হয়েছে, আর শহরের যন্ত্র-সভ্যতার চাপে বন্দী হ'য়ে তারা হ'য়ে উঠেছে একেবারে যান্ত্রিক মানুষ।

২২শে মে। সকালে প্রথমেই গেলাম ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের-এর অফিসে। নিউইয়র্ক থেকে আমরা ওয়াশিংটনে-এ যাব। তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট থেকেই করা হয়েছে। এদের সাহায্য পেয়ে আমাদের এদেশে ঘোরাফেরার খুবই সুবিধা হয়েছে। কাজ সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটি Cafetaria-তে গেলাম।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত এই সব খাবার ঘরগুলি জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ ও সুবিধার কারণ হয়েছে। আমেরিকার খাদ্যাদি অতি উৎকৃষ্ট, যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত প্রত্যেকটি খাদ্যদ্রব্যই বিশেষ সারবস্তুযুক্ত। গভর্ণমেণ্টের কড়া আইনের চাপে ভেজালের কারবার এদেশে ঢুকতে পারেনি।

এই খাবার ঘরটি প্রায় পুরো কাঁচেরই তৈরী, দরজাগুলি পুরো এক একখানি আস্ত কাঁচের। ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টিলের ঝক্‌ঝকানিতে চোখ ঝল্‌সে যায়। যন্ত্রের সাহায্যে খাবার ডিশগুলি অতি অল্প সময়েই প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। এই সব Cafetaria-তে টেবিলে খাবার দেবার জন্য কোন ওয়েট্রেস থাকে না, নিজেদেরই ট্রেতে খাবার সাজিয়ে টেবিলে এনে বসে খেতে হয়; বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে তাতে কোন অসুবিধা নেই। হাজার হাজার লোক এখানে অনবরত এমনি করে খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকে একটি করে মাংসের ডিশ, টাট্‌কা ষ্ট্রবেরী আইসক্রীম এক বাটী ও এক কাপ গরম কফি নিয়ে টেবিলে বসলাম।

এদেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতিও সরকারের যথেষ্ট নজর। কাঁচের বাসন ও ছুরিকাঁটাগুলি একবার ব্যবহারের পরই যন্ত্রের ভিতরে ফুটিয়ে বিশুদ্ধ ক'রে নেওয়া হয়। এই সব খাবার ঘরগুলিতে কাগজের ব্যবহারই বেশী। দৈনিক প্রতি দোকানে কাগজের খরচা প্রচুর। গেলাস থেকে আরম্ভ করে সিগারেটের ছাইদানি পর্যন্ত কাগজের তৈরী। এগুলি একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়া হয়।

আজ রাতে Dr. Taylor-এর বাড়ী আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। Dr. Taylor, Columbia University-র একজন বিশিষ্ট প্রফেসার ও

আমেরিকার খ্যাতনামা ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকেন, নিখুঁত পরিপাটী সংসার। শহুরে জীবনের ঘোলাটে আবহাওয়ার মাঝেও যে এই রকম সাদাসিদে ধরণের সুখী পরিবার থাকতে পারে, তা আমার ধারণা ছিলনা।

ডাক্তারের সাথে খুব গল্প জম্‌লো,—যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক তথ্যই আলোচনা হ'ল। আলাপ পরিচয়ের পর তাঁরা অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁদের ঐ ছোট্ট বাড়ীটিতে অতিথি হ'য়ে থাকার জন্য আমাদের অনেকবার বল্লেন। এঁরা ভারতবর্ষেব বিষয় বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হল না। শুনলাম, এখানে ভারতের বিষয়ে বিশেষ কোন বইও নাকি নেই; কেবল মাসিক পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে যাকিছু ভারতের খবরাখবর বেরোয়, সেইটুকুই মাত্র পড়েন। মিসেস টেলার একখানি "Life" পত্রিকা এনে আমায় দিলেন। পাতা উল্টে দেখি তাতে লেখা রয়েছে—ভারতের বেদবেদান্ত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রগুলি নাকি ২০০ বৎসর আগে ইংরাজ ভারতে আসবার প্রাক্কালেই রচিত হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম এই হাস্যকর প্রপাগাণ্ডাটি এদেশের মানুষদের বোঝাবার পক্ষে বেশ উত্তম প্রয়াসই হয়েছে। কারণ দেশটি প্রগতির অগ্রগতিতে ছুটলেও দেশদেশান্তরের জ্ঞানানুসন্ধানে বা তত্ত্বানুসন্ধানে বড়ই উদাসীন। এঁরা তো মহা গুরুত্বের সঙ্গে ঐ সকল পত্রিকা প'ড়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এদেশে আর একটি প্রশ্নের বিশেষ আন্দোলন চলছে—সেটি হ'ল হিন্দুদের 'Caste System'। আমার কপালে কুমকুমের টিপ্‌ দেখে মিসেস্‌ টেলার জানতে চাইলেন যে ওটা কোনো, Caste-এর চিহ্ন কিনা। আমি যখন উত্তরে বললুম যে, ঐ ফোঁটার সাথে Caste-এর কোনো সম্বন্ধই নেই, বরং তাঁদের ভাষায় ঐটাকে Beauty spot বলা চলে, তখন তিনি বিষম ধাঁধায় পড়লেন। ইতিমধ্যে খাবারের ডাক পড়ল। খাবার এল ঐ একপদ সাদাসিদা ধরণের। খুব গল্প করতে করতে আহার করা গেল। তারপর অল্প একটুক্ষণ বসেই বিদায় নিলাম।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম। স্বামীজী তখন মন্দিরে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে গীতার ব্যাখ্যা করছিলেন। স্বামীজীর অনুরোধে উপাসনা শেষে দুই একটি ভজন ও কীর্তন গাইলাম।

তিনি তো খুবই খুশী; বিদেশী ভক্তবৃন্দ কিছু না বুঝতে পেরেও আমায় খুব আপ্যায়িত করে বল্লেন,—"আজ সন্ধ্যায় ভারতকে তুমি আমেরিকায় এনেছ।" রাত প্রায় এগারোটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

২৩শে মে। আজ বেলা ১টার সময় এখানকার Planatorium দেখতে গেলাম। কি ভাবে এই সৌরজগতে গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল ঘটে এবং কি নিয়মে তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই সকল বিষয় দেখবার জন্যই এই শিক্ষা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। গম্বুজওলা গোলাকার বাড়ী, দুই তলা উঁচু। আমরা নীচের তলায় একটি গোল ঘরে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে নীল দেওয়ালের গায়ে নক্ষত্রগুলি আঁকা। উপরে সিলিঙে সৌর জগতের গ্রহগুলি ইলেক্‌ট্রিকে ঘুরছে। একজন জ্যোতির্বিদ্‌ লাউডস্পীকার মারফৎ সমস্ত সৌরজগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করছেন। ইস্কুল কলেজের বহু ছেলেমেয়ে রয়েছে, অবসর সময়ে তাদের পিতামাতারাও এই সকল বিষয় শুনতে ও দেখতে আসেন। এই কঠিন জটিল তত্ত্বটি অতি সোজাভাবে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিয়ে দেওয়া হয়। শিশুরা ছোট থেকেই এই সকল বিষয় ভাবতে শেখে।

আমরা দোতালায় গিয়ে আরেকটি গোল ঘরে ঢুকলাম। ঘরের চারিদিক কালো কাপড়ে মোড়া, গোল দেওয়ালের ধারে ধারে ছোট ছোট খেলনার মত নিউইয়র্কের বাড়ীগুলি সাজানো। শাদা ধবধবে ছাদটি গোলাকার ও খুব উঁচু। ঘরের মাঝে একটি প্রকাণ্ড জার্মান যন্ত্র রয়েছে। যথাসময়ে দরজা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করা হ'ল। শাদা ছাদটি নীল আকাশ হ'য়ে উঠল, সূর্যদেব ধীরে ধীরে নিউইয়র্কের বাড়ীগুলির আড়ালে অস্ত গেলেন। অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র অন্ধকার রাতে আকাশের গায়ে ফুটে উঠলো। আকাশে সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ কি কারণে কেমন করে হয়, তা অতি প্রাঞ্জল ভাবে একজন অধ্যাপক সবিস্তারে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিতে লাগলেন। শেষ হ'তে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, দরজার সামনে প্রকাণ্ড একটা উল্কা (Meteor) রয়েছে—দেখতে যেন পালিস করা চকচকে একতাল লোহা। ঘরের চারিদিকে অনেকগুলি এই রকম ছোট বড় উল্কা রয়েছে। শুনলাম, এই বছরেই নাকি গ্রহ-সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর উপর আরেক খণ্ড উল্কা

(Meteor) এসে পড়েছে। প্লেনেটোরিয়ম্ থেকে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ আশ্রমে গেলাম, সেখানে রাতে আহার করার কথা।

২৪শে মে। আজ সকালে আবার একবার ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের অফিসে যাওয়া গেল। সেখানে Miss Belt-এর কাছে কথাপ্রসঙ্গে শুনলাম যে, এখানকার 'Macys' দোকানটিতে পীন থেকে এরোপ্লেন অবধি সব কিছুই কিন্‌তে পাওয়া যায়। সারা আমেরিকার যাবতীয় তৈরী মাল নিউইয়র্কের এই দোকানটিতে মেলে।

কাজ সেরে Macy-তে যাওয়া গেল। মস্ত বড় Sky-scraper ; তার ভিতর ১৮৮টা বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র দোকান-বিশেষ। লক্ষাধিক লোকের ভীড় দৈনিক হয়। দেশবিদেশের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ৭০০ জন guide নিযুক্ত রয়েছে ; তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার জন্য Interpreter-ও আছে। এই বাড়ীটি শুধুই Skyscraper নয়, মাটির নীচেও তিন তলা পর্যন্ত নেমেছে। দোকানের ভিতরে লোক যাতায়াতের জন্য অসংখ্য Elevator ও Escalator আছে।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে Alice in Wonderland অভিনয় দেখতে থিয়েটারে গেলাম। হলিউডের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী Alice-এর অংশে অভিনয় করলেন ; এমন চমৎকার স্বাভাবিক অভিনয় আমি পূর্বে কখনও দেখি নি ;—অদ্ভুত অভিনয়-দক্ষতা !

২৫শে মে রবিবার। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ঘরেই কাটালাম। রাতে ওক্‌লাহামা থিয়েটার দেখতে গেলাম। এখানকার বড় বড় থিয়েটার-গুলিতে হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়ে বিশিষ্ট অংশে নামানো হয়। ওকলাহামার Slang কথাযুক্ত গান ও কথোপকথন না বুঝলেও, এমন চমৎকার প্রকাশভঙ্গী ও ভাবার্থ ফুটে উঠছিল যে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। অর্কেষ্ট্রার সাথে গানগুলি অতি সুমধুর লাগল। রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন রংএর সমাবেশে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যেন সত্যকারের সজীব দেখাচ্ছিল।

সাত

ওয়াশিংটন

Washington ষ্টেশনে একজন লালটুপী পরা লোক—যাদের Red-cap helper বলা হয়—গাড়ী থেকে আমাদের মাল নামিয়ে তু'চাকার একটি ঠেলা গাড়ীতে তুলে নিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি, ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের কাছে লোকটি দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। Mayflower Hotel-এ ২০ তলায় একটি ঘর পাওয়া গেল। ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের এর সাহায্যে এখানেও ঘর আগে থেকে রিজার্ভ করা ছিল।

২৭শে মে। ভোরে ঘুম ভেঙ্গেই দেখি নতুন জায়গায় রয়েছি। নতুন শহর দেখার উৎসাহে ও আনন্দে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সামনেই Capitol প্রাসাদ—বিরাট গম্বুজওলা চুঁড়ো—রাজধানীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কংগ্রেসের সভাসমিতির



আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় (সুপ্রিম কোর্ট)

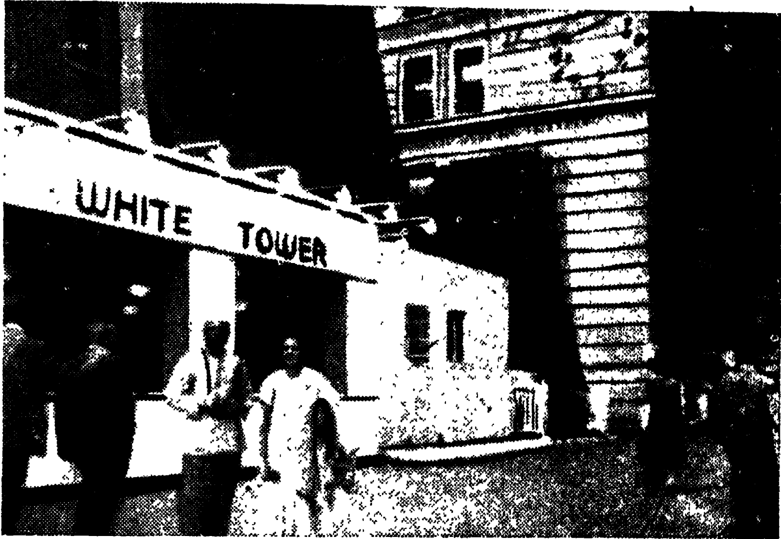
আসর এই প্রাসাদকক্ষেই হয়ে থাকে। গম্বুজওলা গোলঘরের তু'পাশে তু'টি বড় হলে সিনেটের অধিবেশন ও হাউস অফ

রিপ্রেজেণ্টেটিভের অধিবেশন বসে। আমরা Cab-এ করে শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। পথে U. S. Supreme Court দেখলাম। বাড়ীটি আগাগোড়া শাদা মার্বেল পাথর দিয়ে গেঁথে তৈরী করা, ধবধবে শাদা রঙের উপর সূর্যের কিরণ পড়ে এত চক্‌চক্ করছে যে, ভালো করে তাকানো যায় না।

ওয়াশিংটনের ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের কর্মীরা নিউইয়র্কের অফিস থেকে আমাদের সকল খবর পূর্বেই পেয়েছিলেন। আজ দুপুরে তাঁরা আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি। স্থানীয় কয়েকজন ডাক্তারও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। আমরা মোট ১২ জন টেবিলে বসেছি। সূপ্ খাওয়া হ'লে একটি মাছের ডিশ এল—সবুজ মোটা কাঁচা লঙ্কার ভিতরে মাছের পুর দিয়ে ভেজে তার সাথে রকমারি সিদ্ধ সবজি দিয়ে ডিশটি সুন্দর করে সাজানো। ডিশটি যেমন সুস্বাদু তেমনই উপাদেয়—ঝালের নামও নেই, অথচ কাঁচা লঙ্কার সুগন্ধে ভরপুর। আহারের শেষে এক গ্লাস বরফ-দেওয়া ঠাণ্ডা চা খেয়ে উঠলাম। এদেশে গরম চায়ের চেয়ে এই রকম ঠাণ্ডা চা-ই লোকে বেশী পছন্দ করে। আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগলো না। খাবার পর ডাক্তারদের সাথে উনি হাসপাতালে গেলেন। আমি, খুকু ও ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টর মহিলা-অফিসারটি কিছুক্ষণ গল্প করে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে হোটেলে ফিরলাম। Washington শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো ও গোছানো। রাস্তার দু'ধারে খুব চওড়া ফুট্‌পাথ। বাড়ীগুলি সবুজ মাঠে ঘেরা। New York-এর মত এখানে ঘেঁসাঘেঁসি Sky-scraper-এর সারি নেই। এখানে লোকও কম, মাত্র ১০ লক্ষ।

পরদিন ২৮শে মে। এখানকার বিখ্যাত Cancer Institute দেখতে উনি সকালেই বেরিয়ে গেলেন। আমরা বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। প্রথমেই রাস্তার মোড়ে White Tower নামে একটি Cafe-তে গিয়ে টাটকা ফলের রস ও এক গেলাস দুধ খেলাম। তার পর বেলা ১টা অবধি শহর বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। উনি ২টার সময় ফিরে এসে সেদিনকার একটি মজার ঘটনার কথা বল্লেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে উনি যখন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে একজন আমেরিকান ডাক্তারের সাথে কথা বলছেন, এমন সময় একটি মহিলা ছুটে এসে দাঁড়াল

ওঁদের সামনে। ওঁর মাথার গান্ধীটুপী দেখে জিজ্ঞেস করলো,-"ঐটা কি গান্ধীটুপী ?" উনি বল্লেন—'হ্যাঁ'। উত্তর শুনেই ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ চুপ করে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল—তার পর—"অনেক ধন্যবাদ" বলেই যেমন দৌড়ে এসেছিল তেমনি ছুটে চলে গেল।

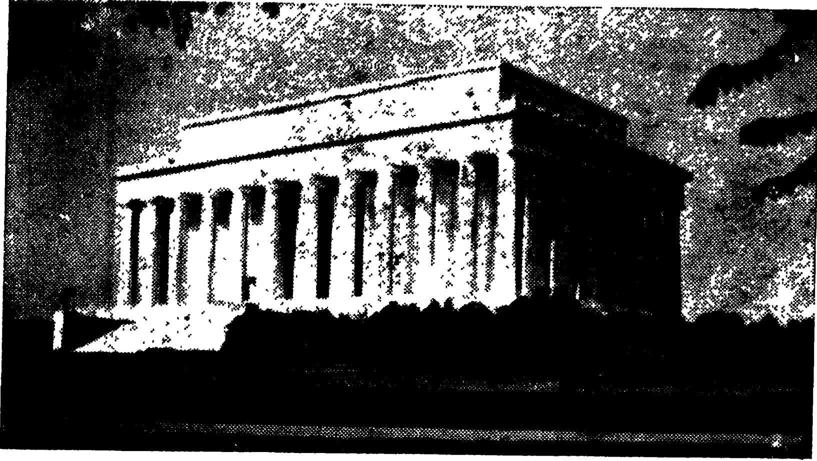


ওয়াশিংটনে একটি কাফেটেরিয়ার সামনে

পরদিন ২৯শে মে। Baltimare Medical Conference-এ যোগ দেবার জন্য উনি ২০ মাইল দূরে John Hopkins Hospital-এ গেলেন। সেদিন প্রায় দুপুর ১টা অবধি ঘুমিয়েছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি—ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় তো চলে গেছেই, লাঞ্চের সময়ও বুঝি যায়! কাজেই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেলাম।

Washington-এর রাস্তার কায়দা বেশ একটু নতুন ধরণের। Capitol-কে কেন্দ্র ক'রে রাস্তাগুলি গাড়ীর চাকার Spoke-এর মত বেরিয়েছে। রাস্তাগুলি Avenue নামে পরিচিত; আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেটের নামে এই এ্যাভিনিউগুলির নামকরণ হয়েছে। 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' প্রভৃতি নামাঙ্কিত ষ্ট্রীটগুলি এ্যাভিনিউগুলির মাঝে মাঝে পরস্পরকে যুক্ত করে বরাবর চলে গেছে।

আমরা পথে প্রেসিডেন্টের বাসগৃহ 'White House' দেখলাম। বাড়ীটি দেখতে খুবই সাদাসিদে প্যাটার্ণের, আড়ম্বর বিহীন। ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ ঘুরে অন্য দিকে সেক্সপীয়র লাইব্রেরী, লিঙ্কন স্মৃতিসৌধ ও জাফারসন স্মৃতিসৌধ দেখে রাত প্রায় ৯টার সময় আমরা হোটেলে ফিরলাম। আকাশে তখনও সূর্যের আলো রয়েছে।



লিঙ্কন স্মৃতি সৌধ (ওয়াশিংটন)

৩০শে মে। আজ আবার একটি টুরিষ্ট ট্যাক্সি নিয়ে সকালেই বেরিয়েছি। এই ট্যাক্সিগুলির মাথায় হুডের উপর রাত্রে 'Sky View' লেখা আলো জ্বলে ; ভারি সুন্দর দেখতে লাগে। আমরা প্রথমে President-এর বাড়ী—White House-এর সামনে নামলাম। বাড়ীর ভেতরে ৮টি ঘরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। আমরা সব ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রথম প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সব প্রেসিডেন্টেরই বড় বড় তৈলচিত্র রয়েছে, দেওয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি পাথরের মূর্তিও সাজানো রয়েছে। প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হ'য়ে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের স্মৃতি একটি ঘরে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসাধারণ থেকেই নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লে তিনি তাঁর Cabinet গঠন করেন। দায়িত্বপূর্ণ কোন

বিশেষ কাজ ক'রতে হ'লে প্রেসিডেণ্ট স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারেন না, কংগ্রেসের সাথে একমত হয়েই তাঁকে কাজ করতে হয়। কোন গোলযোগ উপস্থিত হ'লে Supreme Court-এর সাহায্য নিতে হয়। আমেরিকার এই কংগ্রেস একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ষ্টেট্ হতে দুই জন প্রতিনিধি নিয়ে Senate গঠিত এবং প্রতি তিন লক্ষ লোক পিছু একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'য়ে House of Representative গঠিত হয়। ৪৮টি ষ্টেটের প্রত্যেকটিতেই স্বায়ত্ব-শাসন রয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই প্রত্যেক ষ্টেট নিজের দেশের শাসনকার্য্যের ভার বহন করে থাকে। কেবলমাত্র ডাক্, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব Federal Government-এর উপর ন্যস্ত।

White House থেকে গেলাম ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে। খুকুর হুকুম মনুমেণ্টের উপর উঠতেই হবে। মনুমেণ্টটি ৫৫০ ফিট উঁচু; Elevator-এ করে উঠতে হয়। মনুমেণ্টের শেষ প্রান্তটি ক্রমশঃ পেনসিলের মত সরু হ'য়ে গেছে, তাই খুকু এটির নাম দিয়েছে 'পেনসিল মনুমেণ্ট'। আমরা সবাই ঐ পেনসিলের চূড়ায় তো উঠলাম। সেখান থেকে Washington শহর সত্যিই ছবির মত দেখায়,—সুচারুরূপে নক্সা টেনে এই শহর গড়া। ধনীর ভাণ্ডার উজাড় ক'রে ঐশ্বর্যময়ী আমেরিকার রাজধানী এই Washington শহর তৈরী হয়েছে।

আমরা মনুমেণ্ট থেকে নেমে সোজা এক বন্ধুর বাড়ী লাঞ্চের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হলাম। ঘুরে ঘুরে ক্ষিদে পেয়েছে খুব; তার উপর আবার দেশী রান্না, ভাত ডাল তরকারী এলো দেখে কি যে আনন্দ হ'লো তা আর বলার নয়। এখানকার চাল, ডাল অতি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। ধনে, জিরে প্রভৃতি সমস্ত রকম দেশী মশলাই গুঁড়ো করা ছোট টিনের কৌটায় পাওয়া যায়।

Tropics-এর সব রকম ফসলই এ দেশে ফলে। মৌসুমি জলবায়ুতে পুষ্ট Florida-র মাটীতে সোনা ফলে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা চাষের যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত Mississippi নদী আমেরিকার মধ্যভাগে প্রবাহিত হ'য়ে সুবিশাল সমতল ভূমিকে বিশেষ উর্ব্বর করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শস্য-ভাণ্ডার এই

আমেরিকা। এখানকার অতি উৎকৃষ্ট জলবায়ু ও মাটী চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ; এই চাষের শ্রীবৃদ্ধিতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

এদেশে শীতের যেমন প্রকোপ, গ্রীষ্মেরও তেমনই প্রখরতা, আবার বৃষ্টির পরিমাণও যথেষ্ট। বিভিন্ন প্রকার চাষের পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট জলবায়ু



ওয়াশিংটনের রাজপথ

সারা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আমেরিকার মধ্য-প্রদেশে গম এত অধিক পরিমাণে জন্মে যে, ঘর-খরচা বাদেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত গম ইউরোপের নানাস্থানে রপ্তানি হয়। আমেরিকার দক্ষিণ-ভাগে অতি উৎকৃষ্ট তূলার চাষ হয়। পৃথিবীর তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ তূলাই এইখানে জন্মায়। পশুপালনের জন্য Rocky-র সুবিস্তৃত তৃণভূমি বিশেষ উপযোগী। পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে California ফলেফুলে সমৃদ্ধ।

৩১শে মে শনিবার। উনি সকালে John Hopkins Hospital-এ গেলেন। আমি আর খুকু আমার সেই বন্ধুটিকে তুলে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। বিকেলে স্থানীয় প্রফেসর Dr. Parks-এর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ। প্রায় ৬টায় ডাঃ পার্কস্ হোটেলে এসে আমাদের তুলে নিয়ে

গেলেন তাঁর বাড়ীতে। বাড়ীটি শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। শহরের বাইরে এই নীরব ও নিস্তব্ধ স্থানে গৃহস্থেরা বেশ সুখে ও আরামে বসবাস করছে। এই পল্লীগুলি দেখতে অতি মনোরম। বসবাসের পক্ষে আদর্শ স্থানই বটে। আমরা Dr. Parks-এর বাড়ী পৌঁছুতেই তাঁর আট বছরের একটি ছেলে ছুটে এলো আমাদের কাছে; তার 'পর খুকুর হাত ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট খেলাঘরটি দেখাতে। Mrs. Parks বড় সুন্দর ও ধীর প্রকৃতির মানুষ; তাঁর সাথে কথা বলতে আমার খুবই ভালো লাগল। খাওয়া হলে বাগানে বসে গল্প করলাম। তারপর Dr. Parks আবার আমাদের তাঁর গাড়ীতে করে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।



ওয়াশিংটনে পার্কস-পরিবারসহ আমরা

১লা জুন। আজ আমরা George Washington-এর আবাসভূমি Mount Vernon দেখতে যাব। বেলা দু'টার সময় আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের তুলে নিয়ে Potmac নদীর ঘাটে উপস্থিত হ'লাম। ষ্টীমারে করে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মাউন্ট ভ্যরনন পৌঁছে গেলাম।

George Washington-এর বাসগৃহ ঘাটের কাছেই বেশ উঁচু জমির উপর অবস্থিত। ওয়াশিংটনের কর্মক্লান্ত জীবনের শেষ দিনগুলি এই

নিরালায় প্রাণময়ী প্রকৃতির কোলেই কেটেছে। আমরা ঘরগুলি ঘুরে দেখে মাঠের মাঝে এসে বসলাম। প্রতিটি ঘরে জর্জ ওয়াশিংটনের ব্যবহৃত জিনিষগুলি অতি যত্নে সাজানো। স্মৃতি সম্বলিত এই বাড়ীটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর ছোট্ট এই সম্পত্তিটি ধূলিধূসরিত. হবার উপক্রম হয়। দেশবাসীর দৃষ্টি তখন এদিকে ছিল না। কালে সবই নিলামে উঠলো, তবুও একটি ক্রেতাও মিলল না। তখন কয়েকটি মহিলা মিলে নাম-মাত্র মূল্যে এই বিষয়টুকু কিনে নেন এবং বহু কষ্টে চাঁদা সংগ্রহ করে বাড়ীটি পুনঃসংস্কার করে রক্ষা করেন। মহিলাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ওয়াশিংটনের এই স্মৃতিটুকু কোনো রকমে রক্ষা হ'ল। তার পরে সরকার-মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল এইদিকে। জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে সেই হতে সরকারই এই স্মৃতি রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন।

মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার জন্য আজ এখানে দলে



জর্জ ওয়াশিংটনের বাসগৃহ

দলে সারা পৃথিবী হতে লোক আসছে। ক্ষুদ্র এই গৃহ-প্রাঙ্গণটি আজ আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় গৌরব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

আট

শিকাগো

২রা জুন। আজ বিকেল ৬টার ট্রেণে শিকাগো রওনা হ্লাম। পুলম্যানের একটি কামরা পূর্বে রিজার্ভ করা ছিল। ট্রেণটি এয়ার কণ্ডিশন করা—এত বেশী ঠাণ্ডা যে, আরামের বদলে আমাদের তো শীতই করতে লাগল, শেষে ওভারকোট চাপিয়ে বসতে হল। ড্রইংরুমে সোফায় বসে দিব্যি আরামে চলেছি। খুকু লেমনেড্ খেতে চাইল। বেল বাজাতেই একজন নিগ্রো কর্মী এল, তাকে coca cola আনতে বলে দিলাম। সে খাবার ঘর থেকে এক গেলাস বরফ দেওয়া coca cola নিয়ে এলো, আর তার সঙ্গে নিয়ে এলো বড় একবাটী বরফ। coca cola পানীয়টি এ দেশে সর্বত্রই প্রচলিত। এ দেশের আরও একটি প্রথা লক্ষ্য করেছি যে, টেবিলে খাবার দেবার আগে সর্ব্বদাই এক গেলাস বরফ জল এনে প্রথমে সামনে দেয়, তার পর হুকম মত সব খাবার আনে। বরফের বাটী ফিরিয়ে দিয়ে দামের সঙ্গে বকশিসও দিতে হ'লো। আমেরিকার এই বকশিসের বহর সত্যিই আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এক এক সময় এমনও হয়েছে যে, দিনের শেষে এই বকশিসের বহর ১০ ডলারও ছাড়িয়ে গেছে।

সারা রাত ট্রেণে কাটিয়ে পরদিন সকাল ৯টায় আমরা শিকাগোতে নামলাম। Hotel Palmer House-এ ২২ তলায় একখানি ঘরে ওঠা গেল। হোটেলটি একটি বিরাট অভ্রভেদী অট্টালিকা (Skyscraper), ভিতরে ২০০০ ঘর রয়েছে; ৩০টা লিফ্‌ট্ যাত্রী নিয়ে অনবরত ওঠা-নামা করছে। হোটেলের চারিদিকে চারিটা বড় বড় বিখ্যাত রাজপথ; প্রত্যেক রাস্তার উপরেই একটা করে সদর দরজা রয়েছে।

আমরা ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে Coffee shop-এ লাঞ্চ খেতে গেলাম। এই হোটেলের ভিতর নেই হেন জিনিস নেই। হোটেলটি একটি ছোটখাট শহর বিশেষ। এখানে ডাক টিকিট থেকে আরম্ভ করে এরোপ্লেনের টিকিটও কিনতে পারা যায়; ছোটখাটো নিত্যব্যবহার্য

জিনিষ থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় curio-ও মেলে। এখানে বিভিন্ন রকমের রেষ্টুরেণ্ট রয়েছে, তার মধ্যে Coffee Shop-এর খাবার বেশ ভাল, অথচ দামে সস্তা।

General Electric কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় এই শিকাগোতে। মিলিয়ান ভোল্ট এক্সরে মেসিন এখান থেকেই কেনার কথা। সুতরাং মেসিন সম্বন্ধে কথা বলিতে উনি G. E. C-তে গেলেন, আমরাও সঙ্গে ছিলাম। মৈমনসিং-এর মহারাজকুমার শ্রীমান্ স্নেহাংশু আচার্য মহাশয় এই যন্ত্রটির মূল্য তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন। ক্যানসার রোগের চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য যন্ত্রটির বিশেষ প্রয়োজন। আর্তের সেবায় ও মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর এই মহৎ দান চিরদিনই তাঁকে অমর করে রাখবে।

এখানকার কাজ সারা হ'লে স্থানীয় ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টে যাওয়া গেল। এই ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য না পেলে আমাদের বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দ যে মাটী হয়ে যেত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অত অল্প সময়ের মধ্যে দূর দেশে হোটেলের বন্দোবস্ত, ট্রেনের বন্দোবস্ত, স্থানীয় ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, হাসপাতাল দেখা—মায় আমাকে ও খুকুকে নিয়ে শহর ঘুরিয়ে দেখানো অবধি সব কিছুই এঁরা করছেন। এখানকার কাজ চুকিয়ে বেরিয়ে রোটারির লাঞ্চে উপস্থিত হলাম।

বিদেশী রোটারিয়ানরা খুবই আনন্দের সহিত আলাপ আপ্যায়িত করলেন। আজকের বক্তব্য বিষয় হ'ল—একজন আমেরিকান পাদ্রীর সাড়ে তিন বৎসর সিঙ্গাপুরে জাপানীর কবলে কারাবাসের করুণ কাহিনী। সিঙ্গাপুর পতনের পর জাপানীরা শত্রুপক্ষ সকলকে বন্দী করল; বক্তা নিজেও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। সমস্ত দেশের লোক ইউরোপ ও এসিয়াবাসী একসঙ্গে ক্যাম্পে দিন কাটাতে লাগলো। শত্রুহস্তে নির্যাতিত ও অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। তিনি বল্লেন,—"আমাদের জীবনে তখন ভীষণ অনিশ্চয়তার ছাপ ঘন মেঘের মত ছেয়ে ফেলেছে। বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, আবার কোনদিন হ'বে কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তাও নেই, এ-হেন অবস্থায় মনের বাঁধ ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি আমার আশার শেষ প্রদীপ নিভে যায়! কিন্তু এ-হেন চরম দুর্দিনেও

পরস্পর পরস্পরের মনের পাশে দাঁড়িয়েছি; জাতিধর্ম সেখানে ছিল না, একমাত্র ছিল মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা ও সহানুভূতি। 'বাঁচ্‌তে হবে' এই সঙ্কল্প করে পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছি। সম্বলের ভিতর ছিল শুধু মনের ঐকান্তিক সংযোগ। বাইরের দিক থেকে কোথাও কিছু সহায়-সম্বল এমন কি সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই। এ সত্ত্বেও এই সর্বহারার দল



শিকাগো শহরের দৃশ্য

যার যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তাই দিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ নিয়েই এক অপূর্ব স্বর্গ সৃষ্টি করলো। সেদিন ছিল—Christmas Day। ছোট ছোট প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে এমন আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল যে, জীবনে আমি কখনও এমন নিবিড়ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ অনুভব করিনি। এই অনুভূতিই আমাদের শেষ সম্বল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

"ক্যাম্পের অদূরেই মহাসাগরের তীর। সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে; বসে বসে অন্যমনস্ক হ'য়ে তাকিয়ে তাই দেখছি। নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত, মন অধীর হ'য়ে উঠছে। মনে হ'ল, এই কঠিন বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে ছুটে চলে যাই। এমন সময় দূরে বহুদূরে সাগরের এক কোণে একটি জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়ল—ভাবলাম ঐ বুঝি আমারই দেশের দূত বার্তা বহন করে আনছে। আশায় মন নেচে উঠলো। সুদিনের ছবি চোখের সামনে ভাসছে। বিশ্বাস হ'ল না, সত্যিই এ আমেরিকার জাহাজ কিনা। তারপর এলো মুক্তির দিন। আমি কোনদিনই ভাবিনি দেশে ফিরে এসে এমনি করে এইখানে দাঁড়িয়ে জীবনের এই কটা দিনের কাহিনী বোল্‌বো।" হলশুদ্ধ লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল, হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। সভা ভঙ্গ হ'লো। বর্ণনা-ভঙ্গীর মাধুর্যে আমরা অভিভূত। কানের কাছে ওই কথাগুলি বারবার প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো।

৪ঠা জুন। হোটেলের কাছেই Grand Park। বিকেলে আমরা হেঁটে সেখানে বেড়াতে গেলাম। Park-টি বেশ বড়, বহু লোক বেড়াচ্ছে। আমরা পরিষ্কার ঘাসের ওপর গিয়ে বসেছি; কয়েকজন আমেরিকান উৎসুক হ'য়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন। কথা শুনে বুঝলাম, তাঁরা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। তাই আমাদের সাথে আলাপ পরিচয়ের এত আগ্রহ। ভারতবর্ষের কোথায় কোন দেশে কোন কোন লোকের সঙ্গে তাঁদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল এবং সেই সব লোকের সঙ্গে তাঁদের কতটা বন্ধুত্ব জমেছিল, সেই সব গল্প তাঁরা সুরু করলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে সেই সকল লোকের খবরাখবর আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা কেউবা কাশ্মীরের লোক, কেউবা দক্ষিণ ভারতের, আর কেউবা আসামের। ধৈর্য ধরে শুনে যাবার পর নিরুপায় হ'য়ে বলতে হ'লো যে, তাঁদের আমরা চিনি না এবং চেনা সম্ভবও নয়।

কিছুক্ষণ বেড়িয়ে মিসিগান (Michigan) হ্রদ দেখতে ইচ্ছে হ'ল। ট্যাক্সি ডাকতে রাস্তার মোড়ে গিয়ে সবাই দাঁড়ালাম। এখানে ট্যাক্সি ডাকার কায়দা বড় মজার। হাতের বুড়ো আঙ্গুল উঁচু করে তুলে কানের পাশে নাড়তে হয়, ট্যাক্সিচালক তা দেখলেই সামনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ খুকু বলে উঠলো, "বাবা, কলা দেখাও, কলা দেখাও, নইলে ট্যাক্সি চলে যাবে।" উনি অনভ্যাস-

বশতঃ 'ট্যাক্সি' 'ট্যাক্সি' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। যখন দেখলেন তা শুনেও ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে, তখন হাতে দু'চার বার তালি ঠুকলেন, কিন্তু তাতেও কাজ হ'লো না, ট্যাক্সি চলে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল তুলে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি আর খুকু হাসতে হাসতে মজা দেখছিলাম। যাহোক্, শেষে ট্যাক্সি মিলল।

আমরা Lake Michigan-এর ধারে এসে বালির পাড়ে বেড়াচ্ছি। কণকণে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তখন তাপ প্রায় ৪০° ডিগ্রীতে নেমেছে। এত হাওয়া যে ওভারকোট পরেও শীতে কেঁপে মরছি। স্থানটি খুব নির্জন। হ্রদের শোভা অতি অপূর্ব। সাগরের মত অতল জলরাশি থৈ থৈ করছে, ওপার দেখা যায় না। পাড়ের কাছে বালির উপর ছোট ছোট ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে; নোনা জলের হাওয়ায় আঁষটে গন্ধভরা। শিকাগোতে শীতকালে নাকি তাপ শূন্য থেকে ২০° ডিগ্রী নেমে যায়। তখন বেশ খানিকটা হ্রদের জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। সেই প্রচণ্ড শীতে যখন জমা বরফের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে এসে শিকাগো শহরের উপর ছড়িয়ে পড়ে তখন শহর শুদ্ধ জমে যাবার জোগাড় হয়। সেই জন্যে এখানকার বাড়ীগুলিতে জানালা দরজা যথাসম্ভব কম, ডবল করে দেওয়া, তার উপর আবার ঘর গরম করার বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা জলের ধারে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে হোটেলের দিকে ফিরলাম।

হ্রদের ধারে ধারে একটি চওড়া রাস্তা শিকাগোর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে শহরের শেষ সীমানা অবধি সোজা বরাবর চলে গেছে—রাস্তাটির নাম Michigan Boulevard।

৫ই জুন। শিকাগোতে চার দিন থেকে আমাদের San Francisco যাবার কথা। আজ রাতে সিনেমায় যাওয়া গেল। রাত ১২টায় ফিরছি, শহরের রাস্তা তখনও সরগরম, গাড়ীর ভীড়ে আর লোকের চাপে পথ বন্ধ। পথের ধারে ক্লাবঘরের নাচ, গান ও আমোদ-প্রমোদের হৈ হল্লায় রাস্তা পর্যন্ত মুখরিত। শুনলাম এখানকার কয়েকটি সিনেমা ও থিয়েটার রোজ সারারাতই নাকি চলে।

হোটেলের ২২ তলার উপরে শুয়েও শহরের গোলমালে ও বিষম আওয়াজে আমার ঘুম আসছে না। রাত তখন প্রায় দুটো, আমি জেগে

আছি ; জানলা দিয়ে দেখি, নীচে রাস্তার ছু'ধারে দোকানের শো-কেসে জোর আলো জ্বলছে, আর পথিকের দল শো-কেস ঘিরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে ; পুরোদমেই গাড়ী চলাচল করছে। এখানে মাঝ রাস্তার উপর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন চলে। প্রায় দোতালার সমান উঁচু লোহার থামের উপর ট্রেনের লাইন পাতা। তার উপর দিয়ে যখন ট্রেন যায়, তখন এত ভীষণ শব্দ হয় যে, প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে ; রাতেও সে গাড়ী চলার বিরাম নেই। পৃথিবীব্যাপী সকল রকম ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হ'ল এই শিকাগো। ব্যবসায়ীদের বড় বড় কারখানা, দোকান ও প্রধান কার্যালয়গুলি এইখানে রয়েছে। Sky-scraper-এর বাড়ীগুলি সকল রকম অফিস ও দোকানে ভরতি।

৬ই জুন। Illinois University-র মেডিকেল কলেজে ক্যানসারের বিষয় বক্তৃতা দিতে উনি সকালেই বেরিয়ে গেলেন। শিকাগোতে আরো ছু'টি



শিকাগো শিল্প বিজ্ঞানের যাদুঘর

প্রসিদ্ধ University রয়েছে—North Western University এবং Chicago University।

আমরা আজ বিকেলে হ্রদের ধারে বেড়াতে গেলাম। হ্রদের কাছে Tribune বাড়ীটির উঁচু চূড়ার উপরে বিমানের পথনির্দেশকরূপে একটি

জোরালো সার্চলাইট আকাশপথ আলোকিত করে ঘুরছে। মিসিগান এভিনিউতে Wrigly Building-এর অভ্রভেদী অট্টালিকাটি শাদা ফ্লাড্ লাইটের আলোয় জ্বল জ্বল করছে। নানারকম আলোর বিজ্ঞাপনের মাঝে দিনের আবহাওয়া লেখা একটি নতুন কায়দার বিজ্ঞাপন দেখলাম।

আমাদের এই Palmer House হোটেলের একদিকে রয়েছে একটি বিখ্যাত প্রশস্ত রাস্তা, নাম State Street। একটু এগিয়ে যেখানে State Street ও Madison Street মিলিত হয়েছে, সেইখান থেকেই শহরকে দিক হিসাবে ভাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ এই মোড় থেকেই রাস্তাগুলোকে পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ নামে বলা হয়।



বিমান হতে শিকাগো শহরের দৃশ্য

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো

৭ই জুন। আজ আমরা সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো রওনা হব। বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে এসে জিনিষপত্তর গোছাতে লেগে গেলাম। বাড়তি কয়েকটা বাক্স এই হোটেলে রেখে অল্প কিছু মাল নিয়ে রাত ৮॥০টায় আমরা এয়ারওয়েজ টারমিনাসে উপস্থিত হলাম। যাত্রাকালে আকাশে কালো মেঘের ঘন ঘোর ঘটা দেখে একটু ভয় হ'ল। পথেই সুরু হ'লো ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ-চম্‌কানি।

যথাসময়ে আমরা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে T. W. A-এর একটি বড় বিমানে উঠলাম। বিমান আকাশে উড়ল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-ছটায় অন্ধকার আকাশ আলোয় আলো হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা যেন আকাশ-পথে বিজলী বাতি জ্বেলে চলেছি। ঘন মেঘের স্তরের ভিতর আলো জ্বলে উঠছে দেখে মনে হচ্ছে, যেন বিরাট পাহাড়ের গায়ে আগুন লেগেছে, আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ভিতরকার গভীর খাদ, ফাটল ও বড় বড় গুহা। এ দৃশ্য কবির কল্পনায় অতি মধুর, চিত্রকরের তুলিতেও মনোমুগ্ধকর, কিন্তু বাস্তব জীবনের চলার পথে, বিশেষ করে বিমান-যাত্রীর পক্ষে এ আকাশ যেমন ভয়াবহ, তেমনি বিপজ্জনক। মনে হচ্ছিল দিদিমণি (কবি রাধারাণী দেবী) যদি সঙ্গে থাকতেন, সুন্দর একটি কবিতা লিখতেন।

প্লেন দশহাজার ফুট উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে। যাত্রীরা সব একে একে পরদা টেনে শুয়ে পড়লো। আমরা প্রায় আমেরিকার মধ্যভাগের উপর এসে পড়েছি। আমেরিকার পশ্চিমে California State-এর প্রসিদ্ধ বন্দর San-Francisco প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। আমরা পশ্চিমের শেষ সীমানার দিকে চলেছি। পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব প্রায় ৩০০০ মাইল।

তখন রাত্রি গভীর। জানালার পরদা সরিয়ে দেখি আকাশ মেঘমুক্ত,—ঘন অন্ধকার রাতে আকাশের গায়ে তারা জ্বল জ্বল করছে।

নীচে সার্চ লাইটের আলো ঘুরছে; সারা পথেই এই রকম আলোর সারি বরাবর রয়েছে। মাঝে মাঝে আলোর সাগর দেখে বুঝলাম শহর পেরিয়ে চলেছি। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশটা জুড়ে এই একই রকমে এবং সমানভাবে উন্নতি লাভ করেছে। কোন দেশটি বড়, আর কোনটি ছোট, বোঝা কঠিন।

বেল্ট বাঁধার জন্য আলো জ্বললো, Colorado State-এর Denver শহরের বিমানঘাঁটিতে বিমান নামলো। বিমান মাটীতে নামলেই যাত্রীদের নামতে হয়। এই প্রথমবার আমাদের বিমান থেকে নামতে হলো না। এই বিমানঘাঁটিতে যে রকম ফ্লাড্‌লাইটের বহর দেখছি তেমন আর কোথাও দেখিনি,—দিনকে হার মানাতে চায়।

সারা রাত আকাশ পথেই কাটলো। সকালে উঠে জানলায় তাকিয়ে দেখি, Rocky Mountains-এর পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে চলেছি, চারিদিকে শুধু কাঁকর আর পাথর। এর মধ্যেই Breakfast সাজানো ট্রে দিয়ে গেল; তাতে রয়েছে একটু ফলের রস, কিছু Cornflake, একটি ডিমের অম্‌লেট, রুটী, মাখন ও এক গেলাস গরম কফি।

জানলায় ফিরে দেখি, নীচে দিগন্তব্যাপী অসংখ্য তুষারশৃঙ্গ—মনে হচ্ছে যেন সাগরোত্থিত ফেনিল তরঙ্গমালা নিথর নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে বরফ ছড়ানো, সরু সরু নদীগুলি শুকিয়ে শুধু কাঁকরভরা পথের মত পড়ে আছে। প্রাণীবাসের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য স্থান; একটি তৃণকুটও কোথাও চোখে পড়ে না। বিমান এত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে যে, ওভারকোট গায়ে দিয়েও শীত মানে না; তাকের উপর থেকে আবার কম্বল পেড়ে গা ঢেকে বসলাম। বেলা প্রায় ১০টায় California-র Los Angeles-এ বিমান নামলো।

এখানে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে আমরা T. W. A.-এর আরেকটি বিমানে করে বেলা ১টায় San-Francisco পৌঁছলাম। Sir Francis Drake Hotel-এ পূর্ব থেকেই ঘর রিজার্ভ করা ছিল।

San-Francisco-তে এখন International Rotary Convention-এর ধূম চলেছে। তাতে যোগ দেবার জন্য দেশদেশান্তরের Rotarian-রা এসে জমায়েৎ হয়েছেন। কাল ৯ই জুন—Convention-এর উদ্বোধন দিবস।

আমরা ঘরে জিনিষপত্তর রেখে আহারাদি সেরে সোজা Civic Auditorium-এ যাবার জন্যে একটি ট্যাক্সি নিলাম। এই Civic Auditorium হ'চ্ছে এদেশের Town Hall। হলের ভিতরে ঢুকতেই চারিদিক থেকে Rotarian-রা এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। আমরা Registration Room-এ গিয়ে তিন জনে তিনখানা Rotary Badge নিয়ে সাজানো হলঘরটির চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। এখানে ছোটখাটো খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ ব্যাপার পর্যন্ত সমস্তই নিখুঁত ভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একখানা ডাক-টিকিট কিনে চিঠি পোষ্ট করা থেকে এরোপ্লেনের Reservation পর্যন্ত সবই এইখানে হয়। মোটের ওপর Civic Auditorium-টি একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হয়েছে।



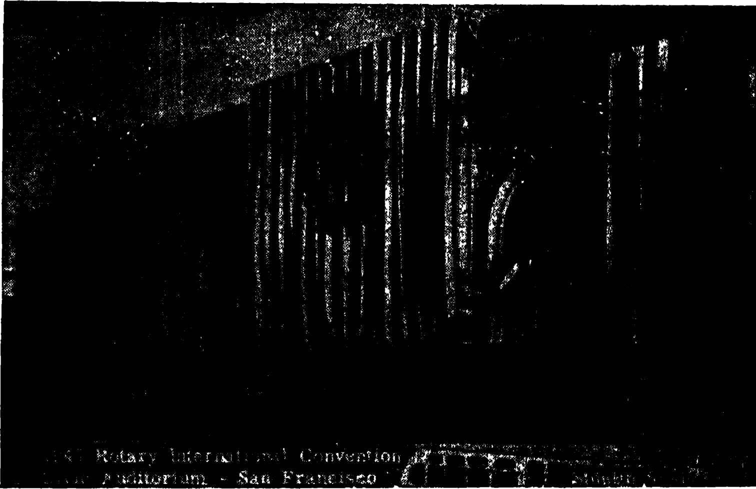
সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহর

আমেরিকান জাতির উন্নতির অনেকখানি কারণই হোলো—তাদের এই উৎকৃষ্ট কর্মপদ্ধতি। প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে একটি নিখুঁত প্ল্যান করে তারপর তাকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে অতি সুচারুরূপে কার্যকরী করে তোলাই হচ্ছে এদের বৈশিষ্ট্য। এই রকম কর্মপদ্ধতি এদের জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়।

গত ৫০ বৎসরে জনশিক্ষার (Mass Education) ক্ষেত্রেও এরা কী উন্নতিই না করেছে! ১৯০০ সালে এদের High School-এ ১১ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেদের শতকরা ১১ জনের বেশী পড়াশুনা করত না। কিন্তু গত ৪৫ বৎসরের চেষ্টায় আজ শতকরা ৯৩টি High School-এ বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে এবং প্রত্যেক আমেরিকান সন্তানকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এই সব ফ্রী স্কুলকে চালু রাখার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স বাড়াতে হয়েছে।

ট্যাক্স আমাদের দেশেও বাড়ছে কিন্তু শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে কি ?

আমেরিকার হাই স্কুলের আর একটি বিশেষত্ব দেখেছি—এই স্কুলগুলো শুধু যে কলেজের জন্য ছাত্র তৈরী করে, তা' নয়। এখানে ছোট ছোট কুটীরশিল্পের ব্যবহারিক শিক্ষার (Vocational Training) বেশ ভাল-রকম বন্দোবস্ত রয়েছে। এই High School থেকে বেরিয়ে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই নিজেদের জীবনযাত্রার পথ খুঁজে নিতে পারে। আমাদের দেশের মতন হাজার হাজার ছেলের কলেজে গিয়ে বি-এ, এম-এ, পাশ করে শেষে ৫০ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করিতে হয় না।



সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো টাউনহল (Civic Auditorium)
(১৯৪৭ সালের International Rotary Convention উপলক্ষে সর্বজাতির পতাকা সম্মিলন)

এদের সুশৃঙ্খল-কর্ম-পদ্ধতির একটি নমুনা পাওয়া গিয়েছিলো গত যুদ্ধের সময়। যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই যতগুলো High School ছিলো, একদিনেই মিলিটারি স্কুলে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। যুদ্ধের জন্য সৈনিক চাই এবং যুদ্ধের উপকরণ তৈরীর জন্য চাই Trained লোক—তাই High School থেকেই সুরু হল শিক্ষার ব্যবস্থা। Short Term Course প্রবর্তিত হল এবং রাত্রিতে সমানভাবে চললো Military Training, Aeronautical Training, Mechanical, Electrical, Automobile

Engineering, Drafting, Blueprint Reading, Radio, Public Health এবং Home Nursing Training। যাদের যুদ্ধে যেতে হ'বে তারা তৈরী হ'য়ে গেল এবং যারা দেশ রক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভার নেবে তারাও প্রস্তুত।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সুষ্ঠু এবং কার্যকরী করতে হ'লে আমাদেরও এই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

এ দেশের আর একটি জিনিষও বড় ভাল লাগলো—সেটা হচ্ছে এঁদের New Progressive School, যেখানে ছেলে মেয়েদের Text Book-এর গণ্ডীর ভিতর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ক'রে না রেখে তাদের ব্যবহারিক জীবনের নানারকম Problems দেওয়া হয়। যেমন একজনকে দেওয়া হল, "কি করে একটি ছোট দোকান তৈরী করতে হবে" সে সম্বন্ধে ব্যবহারিক দিক থেকে যা যা দরকার সব কিছু সন্ধান করে শিক্ষালাভ করা। পরে হয়ত এই ছেলেই আমাদের Army Navy কিংবা Hall & Anderson-এর মত একটা মস্ত বড় দোকান করতে পারবে। অন্য একজনকে হয়ত দেওয়া হল যে, কি করে একখানা বই publish করতে হয়। এ রকম বহু ছোট ছোট জিনিষের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়; জীবন যাত্রার একটি নির্দিষ্ট পথের সন্ধান তারা এমনি করে পায়। হাই স্কুলে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য পাঠ্যতালিকা বাদে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। ছোট ছোট শহরের স্কুল গুলিতে স্থানীয় লোকদের পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা পাবার জন্যে Parent Teacher's Association আছে। এখানে মাতাপিতারা শিক্ষকদের সহিত একত্রিত হ'য়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা করেন। স্কুলের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে এঁদের অনেকটা হাত থাকে।

৯ই জুন। প্রাতরাশের পর Street-car-এ করে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলাম। San Francisco পাহাড়ে জায়গা, শহরের সর্বত্রই উঁচু নীচু। কয়েকটি রাস্তা খুবই খাড়াই। এত খাড়াই রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাম চলতে দেখলে মনে হয়, এখনি বুঝি গড়িয়ে পড়ে যাবে; এ সব রাস্তায় হেঁটে চলাই দায়! রাস্তাগুলি ধাপে ধাপে উপর থেকে নীচে বহুদূর অবধি

নেমে গেছে—দেখতে ঠিক সিঁড়ির ধাপের মতন। রাত্রে আলো জ্বললে শহরে যেন আলোর ঢেউ খেলে যায়।

এ দেশে অধিকাংশ অধিবাসীই হ'ল Spain দেশীয়। রং বেরং-এর টালি দিয়ে নক্সা করা ঢালু ছাদের রঙিন কুটীরগুলি Spanish শিল্পেরই নিদর্শন। সবুজ মাঠের মাঝে নানা রঙের ফুল ফুটেছে, তার মাঝে এই রঙিন Spanish বাড়ীগুলি দেখতে অতি মনোরম। সারা দেশটাই যেন ফুলের বাগান। এমন রং-এর ছড়াছড়ি আমি আর কোথাও দেখিনি।



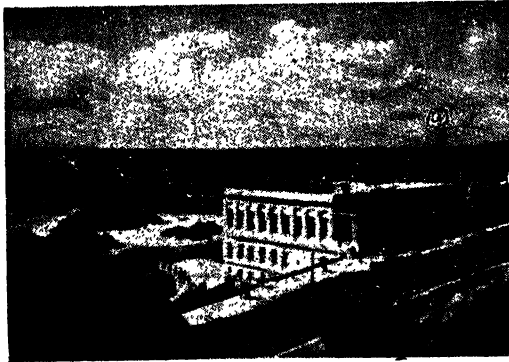
চায়না টাউন

California নাতিশীতোষ্ণ দেশ। নীলাকাশে স্নিগ্ধ ও মধুরভাবের আমেজ। লোক সংখ্যা এদেশে বেশী নয়।

আমেরিকায় তুই দিকের এই তুই সমুদ্র উপকূলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও মানুষের জীবনযাত্রা একেবারেই বিপরীত ও ভিন্ন রকমের। অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের তীর বড় বড় শহর ও বন্দরে ভরে গেছে। এই দিকেই

রয়েছে সকল রকম ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রধান আড়ত। ইংরেজ সর্বপ্রথম পূর্ব দিকেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আজ সেই সকল স্থানে Sky-scraper-এর সারি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমে এই বিশাল পার্বত্যঅঞ্চলটি থাকায় পূর্ব পশ্চিম সংযোগের বিশেষ ব্যবধ্যানের সৃষ্টি হয়েছে। পূবের মত পশ্চিমতীর মহানগরীর কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে ওঠেনি। শিল্প-সম্ভারেও এদেশগুলি ততোধিক সমৃদ্ধিশালী নয়।

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে চীনেদেরও বেশ একটি বড় রকমের ঘাঁটি আছে—স্থানটিকে বলা হয় China Town। এই চীনেপল্লীর বাড়ীগুলি চীনদেশের শিল্পানুকরণেই তৈরী। পল্লীর ভেতরে ঢুকলে মনে হয় চীনদেশে এলাম। চীন দেশের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প এখানে দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ী, ঘর, দোকান, রেষ্টুরেণ্ট সবই তাদের দেশীয় কায়দায় সাজানো। আমেরিকায় এই রকম বিভিন্ন দেশের লোক এসে তাদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী গঠন করে বসবাস করছে। এরা সবাই মিলে হয়েছে আজ "আমেরিকান" জাতি।



সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ক্লিফ্‌ হাউস—সাগরবেলা

সমুদ্র-সৈকতে বেড়াচ্ছি। প্রশান্তমহাসাগর তীরে বালির উপর দাঁড়িয়ে মনে হল—ঐতো ওপারেই আমাদের দেশ, আমরা ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষের কত কাছেই না এসে পড়েছি, মাঝখানে শুধু এই সাগরটুকুই যা ব্যবধান।

সমুদ্রের পাড়ের কাছে অর্ধজল-মগ্ন দুটি শিলাখণ্ডের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বড় শিলাস্তূপটির উপর অসংখ্য শীল মাছ শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কতকগুলি আবার পাথরের গা-বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলে নামছে। পাশের শিলাটিতে বসে এক ঝাঁক Seagulf রোদ পোয়াচ্ছে। শীতকালে এই শীলমাছগুলি জলের তলায় কোথায় চলে যায় এবং পাখীর ঝাঁকও কোথায় উড়ে পালায়; আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই এরা এইখানে এসে উপস্থিত হয়।

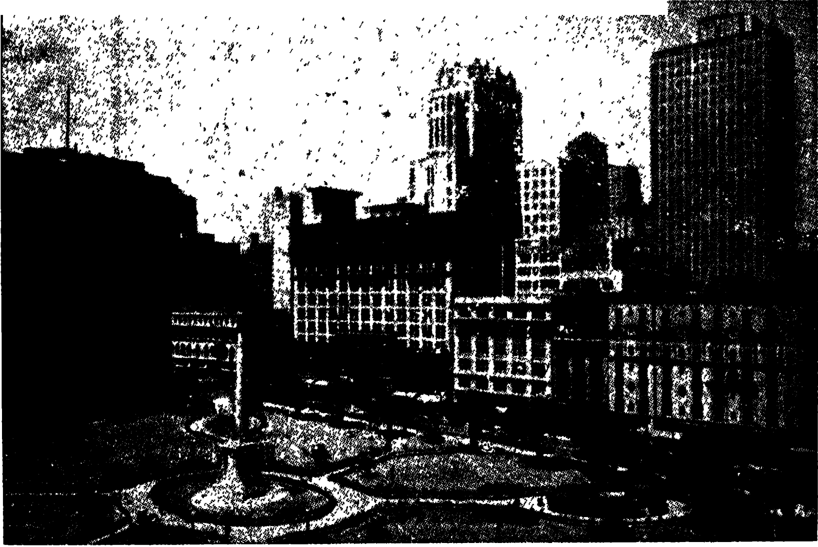
সাগরতীরে বেড়াতে বেড়াতে কত নতুন দেশের Rotarian-দের সাথে আলাপ পরিচয় হ'লো। আমেরিকার দক্ষিণ ষ্টেটগুলি থেকেও বহু রোটারিয়ান এসেছেন। আমাদের এই ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁদের কৌতূহল একটু অতিমাত্রায় দেখা যাচ্ছিল।

এদেশে ক্যারেট গোল্ডের গহনাই চলে বেশী, নকল মুক্তা ও নকল পাথরের তো ছড়া ছড়ি। মেয়েরা যথেষ্ট গহনা পরে থাকে—গলায় পরে মোটা শিকল প্যাটার্ণের হার, আর হাতে জড়ানো 'বিজ্ঞাপনের' মালা—অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীর মার্কামারা জিনিষগুলি ছোট ছোট খেলনার মত তৈরী করে এই মালায় ঝোলানো। ছবি তোলা ও নাম ঠিকানা নেওয়ার পালা শেষ হ'লে হোটেলের দিকে রওনা হ'লাম।

আজ রাত ৮টায় Rotary-র প্রথম উদ্বোধন-উৎসব দেখতে Civic Auditorium-এ গেলাম। হল ঘরে ঢুকে লোক দেখে তো অবাক! প্রায় বিশ হাজার লোক আসন অধিকার করে বসে আছে। সামনে একটি বিরাট ষ্টেজ, ষ্টেজের উপরে ঝুলছে প্রকাণ্ড একখানি চক্রচিহ্নিত পাতাকা। ষ্টেজের পরদা উঠতেই কনসার্ট বেজে উঠল, তারপর নাচ গানের পালা; শেষে California-র Pageantry দেখানো হল। কিছুক্ষণ আমরা যেন California-র কোন সে এক প্রাচীন যুগের জীবনধারার মধ্যে এসে পড়েছি। এই নিভৃত কোণের অজ্ঞাত স্থানটি কেমন করে সুসভ্য মানবসমাজের একটি শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমিতে পরিণত হ'ল, তারই জীবন্ত ছবি চোখের সামনে রূপায়িত হ'য়ে উঠলো। হোটেলে ফিরলাম অনেক রাতে।

১০ই জুন। San-Francisco-তে আসার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল California-র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিন কয়েক বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করা। তার সাথে Rotary Convention-এর উৎসবে যোগ দিয়ে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছে।

সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। একটি সুন্দর পার্কে এসে দেখি, পার্কের নীচে মাটীর তলায় (underground) মস্ত বড় একটি গাড়ীর গ্যারেজ রয়েছে; সেখানে প্রায় ২০০০ গাড়ী রাখা যায়। এতগুলি গাড়ী নিয়ন্ত্রণের



সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো য়ুনিয়ন স্কোয়ার। এর তলায় অর্থাৎ মাটীর নীচে, গাড়ী রাখবার গ্যারাজ রয়েছে

জন্য ভিতরে রীতিমত সকল রকম সুবন্দোবস্ত রয়েছে। হোটেলে ফিরে এসে অলস নিদ্রায় দুপুরটা কাটানো গেলো।

এ কয়দিন ধরে সকাল সন্ধ্যে Rotary Convention-এর নানারকম প্রোগ্রাম চলেছে। বিকেলে বেড়িয়ে হোটেলে এসে সান্ধ্য আহারের জন্য Coffee Shop-এ যাচ্ছি, এমন সময় একদল Rotarian সেইখানেই আমাদের সাথে আলাপ জমিয়ে একরকম জোর করে ডিনার খাবার জন্য একটি ইটালিয়ান Rendezvous-তে নিয়ে গেলেন। এঁরা সব Oakland অধিবাসী।

রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দেখি, বড় একটি খাবার টেবিল সুন্দর সাজানো রয়েছে; বুঝলাম পূর্বেই রিজার্ভ করা ছিল। সুন্দর Italian Serenade বাজছে। আমরা টেবিল ঘিরে বসতেই হোটেল-ম্যানেজার লাউড স্পীকার মারফৎ ঘোষণা করলেন, "ভারতীয় রোটারিয়ান মিত্র-পরিবারকে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি।" Song of India গানটি বাজানো হ'লো। এক ব্যক্তি মাইক্রোফোনের সামনে এসে গান ধরলেন। টেবিলে খাবার এলো—লাল বড় বড় সিদ্ধ কাঁকড়ার দাঁড়া একটি ডিসে সাজানো, তার সঙ্গে রয়েছে কিছু কাঁচা সবজি ও চাটনি। আস্ত বড় বড় দাঁড়াগুলি এমন সুন্দর করে ভাঙ্গা যে হাতে ধরে খোলা খুলে অনায়াসে কাঁটার সাহায্যে মাছ বার করে খাওয়া যায়। খুব খুশী হ'য়ে আমি আর খুকু কাঁকড়া খেতে লাগলাম। বন্ধুরা নৃত্য সুরু করলেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত শোনাবার জন্যে লাউডস্পীকার মারফৎ অনুরোধ এলো। কি করি, ভীষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে উঠে মাইক্রো-ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো—"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের এককলি গেয়ে ফিরে এলাম। কয়েকটি ইটালিয়ান গান শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো।



সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর মাছ ধরিবার বন্দর

সুরের ঝঙ্কার তুলে দ্রুতগতির গানগুলি বেশ মাতিয়ে তুলেছিল। Waiter বিল নিয়ে এলো, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একমুঠো ডলার তুলে বিলের উপর ফেলে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন; গোণাগুন্তির বালাই নেই। উনি উঠলেন বিলের টাকা দেবার জন্যে, ভদ্রলোক ওঁর হাত ধরে বল্লেন,—"আপনারা আমাদের অতিথি, আমরা যখন আপনাদের

দেশে যাবো, আপনারাও আমাদের খাওয়াবেন।" তারপর সবাই মিলে Civic Auditorium-এ গিয়ে রোটারিয়ান পরিবারদের নৃত্য উৎসব দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে নাচছে। চারিদিকে কালো কালো মাথাই ঘুরছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার ১১ই জুন। আজ আমরা Standford University দেখতে যাবো। সেখানে একজন প্রফেসারের সাথে ওঁর কিছু কাজও রয়েছে। ষ্ট্যণ্ডফোর্ড ইউনিভারসিটি সান্‌ফ্রানসিসকো থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। দূরে যাতায়াতের জন্য এখানকার বাসষ্টেশনগুলিতে সুবন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা লাউডস্পীকারের নির্দেশ মত বাসে গিয়ে উঠলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে চলেছি, এক দিকে পাহাড়, আর এক দিকে জল—মাঝখানে সরু পথ দিয়ে চলেছে আমাদের বাস।

খুকু আর উনি একদিকে বসেছেন; আমার পাশের সিটটি খালি। মাঝ পথে একটি নিগ্রো পুরুষ ও মহিলা উঠলো। মহিলাটি আমার পাশে এসে বসলো, নিগ্রো পুরুষটি জনৈকা আমেরিকান মহিলার পাশে একটি খালি সিটে গিয়ে বসলো। আমেরিকান মহিলাটি তৎক্ষণাৎ বেশ উসখুস করে উঠলেন। "কালো আদমী" পাশে বসেছে, অসোয়াস্তির আর সীমা নেই। অবশেষে আমার পাশের সেই নিগ্রো মহিলাটিকে ডেকে গদগদ ভাবে বললেন,—"তোমরা দুজনে একজায়গায় বসতে পেলে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে। আমার মনে হয় তুমি আমার জায়গায় এসে বসো, আমি তোমার সিটে গিয়ে বসি।" নিগ্রো মহিলাটি এর অর্থ বুঝেছিলো; সে উত্তর দিলো,—"Seat makes no difference to me"—"আমার কাছে সিটের স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই, তুমি যদি ইচ্ছা করো তো অন্য সিটে উঠে যেতে পার"। মুখের উপর উত্তর পেয়ে আমেরিকান মহিলাটি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলেন। শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

Coloured People-এর (নিগ্রোজাতির) ভাগ্যে এদেশে নিত্য এই রকম বহু অসম্মানকর ঘটনা ঘটে। অপমানে ও অমর্যাদায় দিন কাটানো এদের জন্মকাল থেকেই অভ্যাস করে নিতে হয়। সামান্য পথে ঘাটে চলাফেরা থেকে আরম্ভ করে কর্মক্ষেত্রে অবধি, এমন কি ইউনিভারসিটির উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিতও যথেষ্ট সতর্ক ও সাবধান হয়ে, স্বতন্ত্র আইন-

কানুনের নিষেধাজ্ঞা পালন করে চলতে হয়। বড় বড় সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, এমন কি ইউনিভারসিটিতে পর্যন্ত এদের প্রবেশ নিষেধ; খাবার ঘর, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি সবই স্বতন্ত্র। তবে মুটে মজুর ও দাসদাসীর কাজে সর্বত্রই এদের দেখা যায়—সেখানে এরা একান্ত অপরিহার্য। এমনও দেখা গিয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ গুণী ও বিদ্বান কোন নিগ্রোর সঙ্গে আমেরিকানদের কোন অফিসে কাজ করতে হলে অফিসের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে শ্বেতকায়গণ নিগ্রো সহকর্মীকে চিনতেই পারেন না এবং পরিচয়ও অস্বীকার করে থাকেন। অথচ এই আমেরিকানরাই ভারতের Caste system নিয়ে সমালোচনায় পঞ্চমুখ!

এ দেশে এখন নিগ্রোর সংখ্যা খুব কম নয়, প্রায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ, প্রতি দশ জনের একজন হল নিগ্রো।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণের ষ্টেটগুলিতে নিগ্রোই বেশী। সেখানে চাষের কাজে গতর খাটিয়ে এরা পুরুষানুক্রমে ধনী বণিকের অর্থ সঞ্চয়ে সহায়তা করে আসছে। কিন্তু তাদের নিজেদের ভালো রকম ভরণ পোষণ তবুও চলে না, একটু বাসস্থানেরও সংস্থান হয় না।

কথায় বলে—"Negro skins the land and the landlord skins the Negro!"

আজ অবশ্য আমেরিকায় কাগজে কলমে নিগ্রোদের দাসত্ব-আইন তুলে দিয়ে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাদের কোন অধিকারই কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পদে পদে মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। কুলি-মজুর ও দাস-দাসী শ্রেণীর লোক এরা। আমাদের দেশের হরিজনদের চেয়েও অস্পৃশ্য হয়ে এরা বাস করছে। তা না হলে, যে Paul Robeson-এর গান শুনতে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সিনেমায় যায়, সেই Paul Robeson-এর নিজের প্রবেশ-অধিকার সে সব সিনেমাতে নেই। যে Dr. Bois বিদ্যায় ও জ্ঞানে Bernard Shaw কিংবা Einstein-এর চেয়ে কোন অংশে কম নন, তাঁরও নাকি Atlanta লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই Dr. Bois হচ্ছেন Harvard Universty-র Ph. D. এবং বার্লিন-প্রমুখ আরো ৪টি ইউনিভারসিটির ডক্টর-উপাধিপ্রাপ্ত। একই দেশের

তথাকথিত স্বাধীন নাগরিক হয়েও এদেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজের লোকেরা পর্যন্ত নিগ্রো সহকর্মীকে রাস্তায় দেখলে চিনতে চায় না, এমন কি পরিচয়ও অস্বীকার করে। Democracy-এর এমন চূড়ান্ত হাস্যকর দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আফ্রিকা হতে আমদানী করা এই হতভাগ্যর দল স্বদেশ ও স্বজাতির বন্ধন ভুলেছে। এদের অতীত মুছে গেছে, বর্তমান এইরূপ নির্যাতন ও নৈরাশ্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পথও অজানা। এ যেন কোন দূর দেশের চারাগাছগুলি উৎখাত করে তুলে এনে এক নতুন অসহায় পরিবেশের মাঝে অপরিচিত মাটীতে অযত্নে রোপণ করা হয়েছে। অনন্ত দুঃখের মাঝে সুরু হয় এদের জীবনযাত্রা এবং চলেছে অপরিসীম অবহেলার মধ্য দিয়ে। জীবনের এ-হেন সংগ্রামে পড়েও এরা নিজেদের শিক্ষার উন্নতির জন্য খুবই সচেষ্ট ও যত্নবান। এদের শিক্ষালয়গুলি সর্বত্রই স্বতন্ত্র অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের স্কুল কলেজে এদের প্রবেশাধিকার নেই। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রতিভা যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। অধুনা নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে; নিগ্রো গ্রেজুয়েটের সংখ্যা এখন প্রায় পঞ্চান্ন হাজার।

গত মহাযুদ্ধের পর নিগ্রোজাতির অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চাকরীর ক্ষেত্রে এদের অধিকার সম্বন্ধে সরকারি মহল হ'তে খুবই সাবধান ও সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পথের মাঝে এই সব নানারকম চিন্তা করতে করতে চলেছি, হঠাৎ দেখি ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী দাঁড়াল। উনি বল্লেন, নামতে হবে, Stanford University-তে পৌঁছে গেছি। নেমে দেখি Dr. Greulich ও তাঁর স্ত্রী আমাদের নিতে এসেছেন। পরস্পর আলাপ-পরিচয় হল, Mrs. Greulich গাড়ী চালিয়ে আমাদের University Town-এ নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের ল্যাবরেটারি-ঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথশ্রমে খুকুকে ক্লান্ত দেখে ডাক্তার অতি যত্নে তাকে তাঁর আরাম কেদারায় শুইয়ে দিলেন, গায়ে একটি কম্বল ঢেকে দিয়ে ও পরদা টেনে দিয়ে বল্লেন, "Honey, ঘুমাও।" এখানে ছোটদের আদর করে "Darling" না বলে "Honey" বলে।

আমরা পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়েছি শুনে তাঁরা দু'জনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কথা-প্রসঙ্গে Dr. Greulich বল্লেন, তাঁরাও দেশবিদেশে বেড়াতে ভালবাসেন; শীঘ্রই কাজের জন্য তাঁদের জাপান যেতে হবে। এ্যাটম বোমায় বিধ্বস্ত Hiroshima-র অবশিষ্ট জীবিত অধিবাসীদের দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাচ্ছেন; সরকার মহল থেকে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে।

বেলা ২টা বাজলে নিকটে একটি Charity Home-এ সবাই মিলে খেতে গেলাম। এটি একটি বিকলাঙ্গদের আশ্রম। কয়েকজন স্ত্রীলোক মিলে



ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভারসিটি

এই আশ্রম পরিচালনা করেন; তাঁরা নিজহাতে আশ্রমের সকল কাজ ও রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে থাকেন। এই রেষ্টুরেণ্টে যা কিছু অর্থ মেলে সবই সেই অনাথ আতুরদের জন্য ব্যয় করা হয়। খাওয়ার পর Mrs. Greulich আমাকে ও খুকুকে University Town ঘুরে দেখাতে নিয়ে গেলেন।

Stanford University একটি ছোটখাট শহর বিশেষ। ছাত্র-জীবনের সাফল্যের জন্য অতি সুচারুরূপে এই University Town তৈরী করা হয়েছে। ছাত্রজীবনকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক এদের জীবনে

শুধু ক্লাশে বা ল্যাবরেটারিতেই সীমাবদ্ধ নয়; দৈনন্দিন জীবনের মাঝে ছাত্ররা শিক্ষকদের সাহচর্যে সত্যিকার মানুষ হবার বহু উপাদান ও শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই University Town-টি তৈরী হয়েছে। এই Stanford University-র একটি ছোট্ট কাহিনী আছে।

Mr. Stanford ছিলেন একজন অতি সাধারণ মানুষ। তিনি সামান্য চাকুরী জীবন হতে আরম্ভ করে পরে ব্যবসায়ে কোটিপতি হয়েছিলেন। এক বছর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী তাঁদের একটিমাত্র পুত্রসহ পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা ইটালীতে পৌছান, পুত্রটি রোগাক্রান্ত

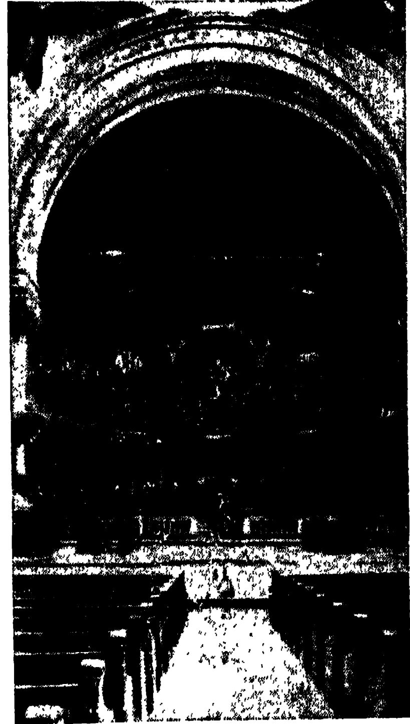


ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটি স্মরণী গির্জা বা উপাসনা মন্দির

হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেইখানে মারা যায়। শোকে মুহ্যমান হয়ে মাতা পিতা স্বদেশে ফিরে যান। তাঁদের সেই একমাত্র পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে আপন সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক দান করে এই Stanford University তৈরী করেন। ছাত্রাবস্থায় যে দীপ নিভে গেছে তার জীবনকে প্রদীপ্ত করে তুললেন শত শত ছাত্রের জীবনের মধ্যে। সার্থক এ স্মৃতি!

আমরা Town-টি ঘুরে দেখলাম। শহরটি যেন মূক হয়ে কাজ করে চলেছে। এই নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে এই রকম একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার যথার্থ যোগ্য স্থানই বটে! ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি সুদৃশ্য chapel-এর সামনে এলাম। Mrs. Greulich গির্জা দেখাতে

নিয়ে গেলেন। গির্জাটির চারিদিকে সবুজ মাঠ ও মাঠের শেষ চার কোণায় চারটি স্তম্ভ। গির্জার সামনে সারা দেওয়ালের গায়ে নানা রং-এর ইটালিয়ান পাথর দিয়ে যীশুখৃষ্টের জীবনী আঁকা। ভিতরের হলটি অতি জাঁক-জমকের সঙ্গে সাজানো। সুসজ্জিত বেদীর মধ্যভাগে দেওয়ালের গায়ে Last Supper-এর ছবিখানি জীবন্তের মত ফুটে উঠেছে। উপরে Balcony-র দু'ধারে বড় বড় পিতলের চোঙগুলির ভিতর দিয়ে সুরের ঝঙ্কার ওঠে। Mr. Standford-এর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী বাকি সমুদয় অর্থ দান করে স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গির্জাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বামী ও পুত্রের স্মৃতিমন্দিরে সর্বস্ব দান করে Mrs. Stanford নিঃস্ব হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এই গির্জায় বসে ভগবৎ আরাধনায় কাটিয়ে গেছেন।



উপাসনা মন্দিরের অভ্যন্তর

আমরা ল্যাবরেটারিতে ফিরে গিয়ে দেখি, তখনও Dr. Greulich ও উনি কাজে ব্যস্ত। একটু পরেই রওনা হওয়া গেল। আমাদের বাস-ষ্টেশনে তুলে দিয়ে Dr. ও Mrs. Greulich ফিরে গেলেন। গোধূলির আলোয় মাঠের অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে ফিরে চলেছি। সাগরতীরে এসে দেখি—আকাশে তখন লাল রং ছড়িয়ে সূর্যদেব সাগরজলে ডুব দিচ্ছেন। অন্ধকারে আকাশ ঢেকে গেল, আমরা San Francisco-তে ফিরে এলাম।

দশ

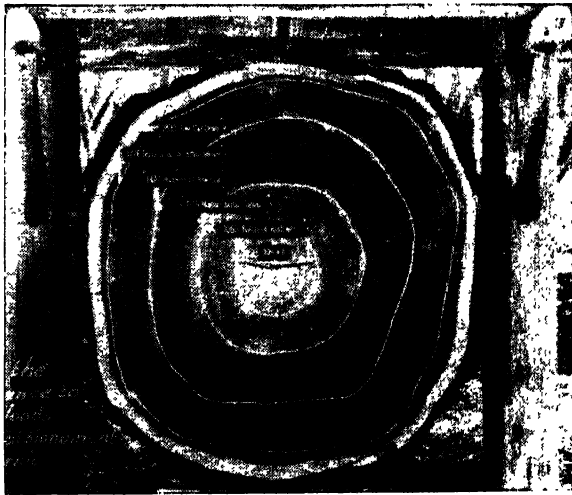
১২ই জুন। আজ ভোরেই খুকু উঠেছে। আমার ঘুম ভাঙ্গতেই সে কোথা থেকে সুন্দর একটি প্লাসটিকের খাপে করা একশিশি সুগন্ধ ওডিকলন এনে আমায় দিয়ে গেল, বল্লে,—"আজ তোমার জন্মদিন, তুমি এটা মেখো।" কিছুক্ষণ 'পরে দেখি আমার নামে এক তোড়া ফুল এল, সঙ্গে গাঁথা এক টুকরো কাগজে খুকুরই স্বহস্ত লিখিত—"Many Happy Returns of the Day." কোথা থেকে যে সে এ সব জোগাড় করেছে তা' জামি না। এ গুলি পেয়ে আমি আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম।

আজ বেলা ১২টায় আমরা ট্যাক্সি নিয়ে বিখ্যাত Red Wood Forest দেখতে গেলাম। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর উপসাগর তীরে 'Golden Gate Park' নামে একটি বিখ্যাত ফুলের বাগান দেখলাম। কথিত আছে, এই 'Golden Gate Park' পূর্বে একটি অনুর্বর বালুকাময় পতিত জমি মাত্র ছিল। কোন একজন সৌখীন ব্যক্তির পরিকল্পনায় ও চেষ্টায় এই পতিত জমিটি একটি সুরম্য উদ্যানে পরিণত হয়েছে।

Golden Gate Bridge-এর উপর দিয়ে চলেছি। উপসাগর তীরে এই ব্রীজটি San Francisco-র একটি দর্শনীয় গৌরবের জিনিষ। ব্রীজটি যেন সরু সূক্ষ্ম সূতোয় গাঁথা। ব্রীজের ওপারে এক নূতন জায়গায় আমরা এসে পড়লাম। চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়, তার মাঝে উপত্যকার উঁচুনীচু পথ। ক্রমে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি, খাদের গাঁ ঘেঁসে গাড়ী ছুটে চলল। হঠাৎ নজর পড়ল খাদের ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলির উপর—ঘন ইউক্যালপিটাসের বন সারা পাহাড়ের গা ঢেকে ফেলেছে। গাড়ী দাঁড় করিয়ে পাতা কুড়িয়ে দেখলাম সত্যই ইউক্যালিপটাসের পাতা কিনা। ইউক্যালিপটাসের বন পেরিয়ে আমরা নামতে সুরু করেছি। শেষে আমাদের গাড়ী একটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে 'Muir Forest' লেখা গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। এটি Red Wood Forest-এরই একটি অংশ।

আমরা নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। বিরাট গাছগুলি ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়িয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড একখানি চাঁদোয়ার

মত ছাউনি তৈরী করেছে। এত ঘন বন যে, গাছের নীচে রোদ ঢুক্‌তে পারে না; মাটী অপরিষ্কার ও স্যাঁৎ-সেতে। এই জঙ্গলের বিশাল বৃক্ষগুলি হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের শাখা প্রশাখা জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত। সামনেই দেখি একটি অতি প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড চাকা করে কেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার উপরে লেখা রয়েছে তার বয়স, পরিচয় ও জন্ম-ইতিহাস। দেখলাম গাছটির বয়স অনুমান ২০০০ বৎসর। আরেকটি প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড এত মোটা যে তার মধ্য দিয়ে মোটর যাতায়াতের রাস্তা করা হয়েছে।



'রেড উড্‌ ফরেষ্টের' একটি অতি প্রাচীন বৃক্ষের একাংশ কেটে তার পরিচয় ও ইতিহাস উপরে লেখা রয়েছে।

এখানে দর্শকের ভীড় বড় কম হয়নি, চারিদিকে ক্যামেরা নিয়ে কেবল ছবি তোলার ধুম চলেছে। জঙ্গলের মধ্যে আবার একটি রেষ্টুরেন্টও রয়েছে। যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে আহারের সন্ধানে ঢুকেছে। পাশেই একটি ঘরে এখানকার কাঠের তৈরী নানারকম souvenir বিক্রয়ের জন্য দোকান রয়েছে।

Red Wood Forest থেকে ফিরবার পথে মোটরচালক ধ'রে বসল, তার বাড়ীটি একবার দেখতে হবে। কথাটা শুনে মোটেই ভালো

লাগল না; ড্রাইভারের বাড়ী আবার যেতে যাব কেন! সময় বেশী নেই বলে প্রথমে কাটাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনক্ষুণ্ণ ও হতাশের ভাব দেখে অল্প সময়ের জন্য ড্রাইভারের বাড়ী দেখতে যেতে রাজী হলাম। ড্রাইভার তখন তার একটি মনের কথা প্রকাশ করে আমাদের জানাল।

ব্যাপারটা হ'ল এই যে, হালের এই যুদ্ধের সময় তার শ্যালক ভারতবর্ষে এসেছিল। বোম্বাই শহরে অবস্থান কালে সে সাংঘাতিকভাবে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং একটি হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতালের ভারতীয় মেট্রন ও ডাক্তাররা নাকি তাকে খুবই সেবা যত্ন করেছিলেন এবং



Red Wood Forest-এর একটি বিরাট বৃক্ষের ভিতর দিয়ে মোটর চলেছে

তাঁদেরই অক্লান্ত সেবা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে ছেলেটি মৃত্যুমুখ হতে ফিরে আসে। সেই থেকে ভারতবাসীর প্রতি তাদের আর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ভারতবাসী দেখলেই তাদের অনুরোধ ক'রে সে তার বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতাসহকারে নানা ভাবে তাদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করে। ড্রাইভার বার বার বলতে লাগল যে, একজন অচেনা ও অজানা বিদেশীকে যারা এমন আন্তরিক সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলতে পারে, তারা সত্যই মহৎপ্রাণের মানুষ। এখানকার ভারতীয়দের সাথে ড্রাইভার ও তার স্ত্রীর খুবই আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে শুনলাম।

পথেই তার বাড়ী পড়ল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাড়াটি—রাস্তায় কোথাও একটু ধুলো কুটো নেই। বাড়ীগুলি সদ্য রং-করা ছবির মতন। ফুলে ফুলে চারিদিক ভরে আছে। গ্যারেজে ড্রাইভারের নিজেরও একটি মস্ত বড় গাড়ী রয়েছে। বাড়ীর ভিতরে ঘরগুলি নিখুঁতভাবে সাজানো—বসবার ঘরে দামী কারপেটের উপরে ভেলভেটে মোড়া সোফা কৌচ, জানলায় সিল্কের পরদা। প্রতি ঘরে একটি ক'রে রেডিও সেট রয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর তাদের ধবধবে শাদা রান্নাঘরটি। সেখানে ওজনকরার যন্ত্র, তাপ দেখার যন্ত্র, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক চুলাটি আবার অটো-মেটিক, রান্না হয়ে গেলে আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ীটি ড্রাইভারের নিজের সম্পত্তি। আমরা ভারতবাসীরা এটা কল্পনাও করতে পারি না, আমেরিকার সামান্য একজন মোটর ড্রাইভারের এত ঐশ্বর্য।

আজ এই সমুদ্রতীরে রোটারিয়ানদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি কার্ণিভেলের বন্দোবস্ত হয়েছে। খুকু আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল —ফিরবার পথে এই কার্ণিভেলটা একবার ঘুরে দেখে যাবে।

সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে কার্ণিভেল ভর্তি। খুব হৈ চৈ চলেছে,—'Merry-go-Round'-এ চড়া, ইলেকট্রিক মোটরে ঘোরা ও Fun House-এ নানা রকম মজার খেলায় সব মেতেছে। কার্ণিভেল থেকে ঘণ্টাখানেক পরে হোটেলে ফিরে এলাম।

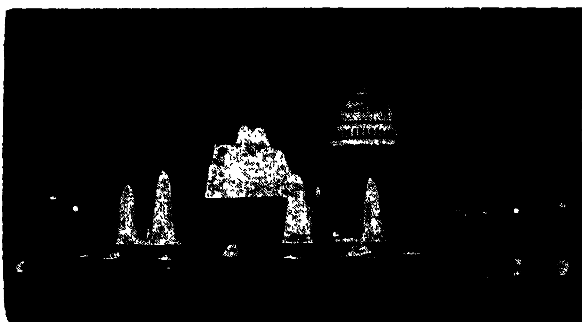
১৩ই জুন। আজ শিকাগো ফিরে যাবার দিন। পশ্চিম প্রান্তে বেড়ানো শেষ হল। এবার আবার পূবের দিকে ফিরে যাব। সকাল ১০৷৷টায় এয়ার-ওয়েজ টারমিনাসে উপস্থিত হয়েছি। ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই বিমান আকাশে উড়ল। United Air Line-এর বিমানগুলি দেখতে যেমন সুন্দর, ভিতরের ব্যবস্থাও তেমনি আরামের। ষ্টুয়ার্ডেশ্‌রা যথারীতি যাত্রীদের দেখাশুনা করছে; অনবরত চকোলেট ও চুইংগাম মুখে নিয়ে যাত্রীরা মুখ নাড়তে নাড়তে চলেছে। দিনের আলোয় পথের শোভা অতি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা রকি পর্বতের উপরে এসে পড়লাম, বিমান ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল দিগন্তবিস্তৃত কুন্দধবল শৈলরাজি, যেন ফেনিল সাগরের শত তরঙ্গমালা

পার হয়ে চলেছি। পর্বতোত্থিত নদীগুলি এঁকে বেঁকে শতধারায় গড়িয়ে পড়েছে। তারপর, জনমানবহীন জলহীন এক বিশাল অনুর্বরভূমি।

বেলা ১টায় ট্রে-সাজানো লাঞ্চ এল—ফলের রস, সুপ, রুটি, মাংস, স্যালাড, আইসক্রিম, কফি, কেক্—ঠাণ্ডা গরম সবই রয়েছে। আকাশে উড়তে উড়তে এই রকম তৈরী খাবারগুলি খেতে আর বাইরের দৃশ্য দেখতে কি ভালোই না লাগছে! খাওয়ার পাট চুকলে যাত্রীরা সব জানলার পরদা টেনে একে একে নাক ডাকতে সুরু করল। আমি বসে বসে বাইরের শোভা দেখছি। বেলা প্রায় ৫টায় বিমান Denver শহরে নামল। বিমানঘাঁটির চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, লাল মাটীর রাস্তা, জায়গাটি বড় সুন্দর।

রাত ২টায় আমরা শিকাগোতে নামলাম। বিমান কোম্পানীর বাসে চড়ে শহরের দিকে রওনা হয়েছি। দেখি, রাস্তায় তখনও লোক চলাচল করছে। দোকানের শো-কেসে জোর আলো, কয়েকটি Drug Store খোলাও রয়েছে। Hotel Palmer House-এর সামনে ভীষণ ভীড়; দরজায় পোর্টার থেকে আরম্ভ করে অফিসে, লিফ্‌টে, দোকানে সর্বত্রই লোক রয়েছে ও রীতিমত কাজ চলছে। হোটেলের নাচঘর ও বসবার ঘর তরুণ-তরুণীর নৃত্যে ও আমোদে মুখরিত। এ দেশে শনিবার ও রবিবার দু'দিনই ছুটী থাকে, তাই শুক্রবার রাত্রি থেকেই নাচ গানের হৈ-হল্লা চলে।

আফিসে খবর নিয়ে আমরা ২১ তলার একখানি ঘরে গিয়ে উঠলাম। ভীষণ ক্লান্ত, তাই মোট-ঘাট ও বাক্স পেটি তেমনি রেখেই শুয়ে পড়লাম।



রাত্রে আলোকোজ্জ্বল ক্যাপিটল

এগার

ক্যানাডা

১৪ই জুন। আমরা প্রাতরাশ সেরে প্রথমেই এয়ার অফিসে খবর নিতে গেলাম—কাল কখন বিমান ক্যানাডার অটোয়া অভিমুখে রওনা হবে।

আজ সারাদিনটা বেড়িয়েই কাটলো। রাতে আবার সেই বাক্স-পেটি গোছানোর পালা। অল্প কিছু কাপড় কয়েকটা বাক্সে ভরে নিয়ে বাকি বাক্সগুলি হোটেলে জমা রেখে গেলাম। তার জন্য অবশ্য মাশুল দিতে হ'ল ভালোই।

১৫ই জুন। আজ বেলা ১০টায় Trans-Canadian Airways-এর একটি বিমানে করে আমরা অটোয়া যাত্রা করলাম। দুই ইঞ্জিনের ছোট বিমান, ২২ জন মোট যাত্রী। আমরা উত্তর দিকে উড়ে চলেছি; আকাশের অবস্থা সুবিধার নয়, বাতাসের আন্দোলনও খুব। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে দুরন্ত বায়ুমণ্ডলের মেঘগহ্বরে পড়ে বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব। থর্ থর্ করে বিমান কাঁপছে, ভয়ে সবাই চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি। ছোট বিমানগুলি সামান্য একটু বাতাসের আঘাতেই দুলে ওঠে, এত অধিক দোলে যে বেশ একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হয়।

বিকেল ৪টার সময় ক্যানাডার উইণ্ডসর শহরে বিমানখানি নাম্‌ল। ক্যানাডার এই প্রবেশ দ্বারে যাত্রীদের সব বাক্স পরীক্ষা, পাসপোর্ট দেখানো ইত্যাদি হাঙ্গামা রয়েছে। এরোড্রোমের মাঠে ব্রিটিশ পতাকা দেখে খুকু মহা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেসা করল,—"ইংরেজদের ফ্ল্যাগ এখানে কেন পোঁতা? ক্যানডার ফ্ল্যাগ কৈ?" ক্যানাডার শাসনকর্তা ইংরেজ শুনে খুকু বল্লে,—"ও! এটা বুঝি আমাদের দেশের মতন?" (তখন অবশ্য ভারতের জাতীয় পতাকা স্বাধীন দেশের সম্মান পায়নি।)

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হল। আমরা এরোড্রোমের ঘরে গিয়ে নিয়ম-কানুন সেরে আবার আকাশে উঠে পড়লাম। বিকেল ৫টায় অটোয়া পৌঁছে গেলাম। শিকাগো সময়ের সাথে এক ঘণ্টা যোগ করে অটোয়ার সময় ঠিক করা গেল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই চলেছি।

আমরা ওয়েটিংরুমে ঢুকে দেখি, ক্যানাডার বিখ্যাত রেডিয়াম ব্যবসায়ী Eldorado Corporation থেকে দু'জন ভদ্রলোক আমাদের নিতে এসেছেন। তাঁরা আমাদের অটোয়ায় থাকার জন্য একটি হোটেলে ঘরের বন্দোবস্তও করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে অটোয়া হ'তে ৫০।৫৫ মাইল দূরে Seignory Club-এর Log Chateau হোটেলে। Dr. Taylor তাঁর অতিথিস্বরূপ এই আমেরিকান ক্লাব হোটেলটিতে আমাদের থাকার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং Eldorado কোম্পানির ভদ্রলোকদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে আমরা Seignory club-এর দিকে রওনা হলাম।

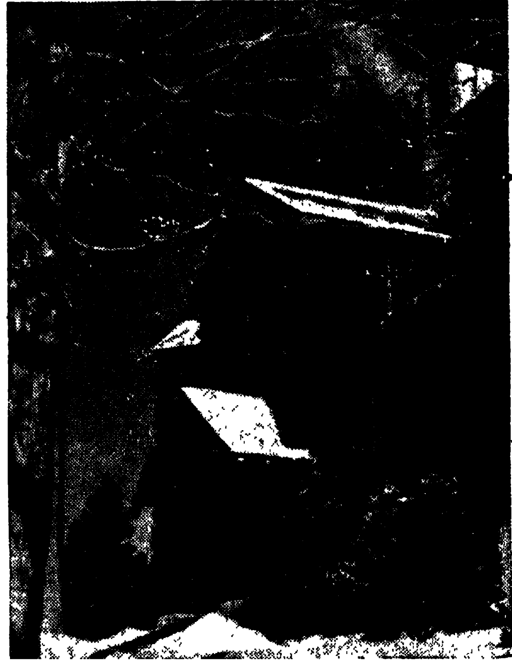
শহর ছেড়ে গ্রামের পথে চলেছি; ভিজা স্যাঁৎসেতে কাঁচা রাস্তা উঁচু নীচু ও অসমান। পথের এক দিকে উঁচু জমিতে লোকের বসতি, অপর দিকে স্থল ভাসিয়ে বন্যার জল বইছে; অর্ধ জলমগ্ন গাছগুলি শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রাণ রক্ষা করছে। এখানে বর্ষায় নাকি প্রতি বৎসর এই রকমই অবস্থা হয়। আমাদের বাংলা দেশের কথা মনে পড়তে লাগলো।

আমরা প্রায় ২৫ মাইল দূরে এসে অটোয়া নদীর ধারে পৌঁছলাম। নদীর বুকে তারে বাঁধা অসংখ্য কাঠের বোঝা ভেসে যাচ্ছে। স্রোতের মুখে কাঠগুলি আপনা হতেই ভেসে ভেসে দূরে আপন গন্তব্যস্থলের দিকে চলেছে। স্বল্প খরচায় এই ভাবে অতি সহজ উপায়ে কাঠ চালান দেওয়া এখানকার একটি বিশেষ ব্যবসা-পদ্ধতি। মাঠ, ঘাট, বন, জঙ্গল পেরিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। হঠাৎ কানে এল জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জন; চেয়ে দেখি স্রোতস্বিনী অটোয়া নদী ভীষণ তুফান তুলে গর্জন করে উঁচু শীলাস্তূপ হতে ধাপে ধাপে বয়ে চলেছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সারা নদী ফুলে ফেনা হয়ে উঠেছে।

Seignory club-এর সদর দরজায় দ্বাররক্ষককে ছাড়পত্র দেখিয়ে গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করল। এক অদ্ভুত নতুন ধরণের কাঠের বাড়ীর সামনে আমরা নামলাম।

বাড়ীটি আগাগোড়া কাঠের। আস্ত লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়িগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছে। বাইরে ও ভিতরে সবটাই ঐ এক ধরণের তৈরী। আস্ত গাছগুলোকে অভিনব ভাবে পরিবর্তিত করে সিঁড়ি, বারাণ্ডা, ঘরের দেওয়াল—এমন কি ইলেকট্রিক

লিফ্‌ট পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। বাড়ীর ভিতরে প্রত্যেক ঘরটি মূল্যবান কারপেটে আগাগোড়া মোড়া, রকমারি আসবাবে ঘরগুলি সাজানো; সকল রকম সুখ সুবিধা ও আরামের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করেছে। বাইরে কনকনে শীত, অথচ ভিতরটা নিয়ন্ত্রিত তাপের দ্বারা বেশ আরামদায়ক গরম। বাড়ীটি তিনতলা, ঘর প্রায় ৫০০টি। তা ছাড়া বড় বড় হলে খাবার, বসবার, মিটিং-এর ও সিনেমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। এই রকম গাছের গুঁড়ির তৈরী প্রাচীন ধরণের বাড়ীর মডেল আমরা সুইডেনের মিউজিয়ামে দেখেছি বটে, কিন্তু প্রাচীনের আবরণে সর্বপ্রকার আধুনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশপূর্ণ এইরূপ একটি বিরাট হোটেল না দেখলে ধারণা করা যেত না।



'লগ শ্যাটু' হোটেলের একদিকের প্রবেশদ্বার

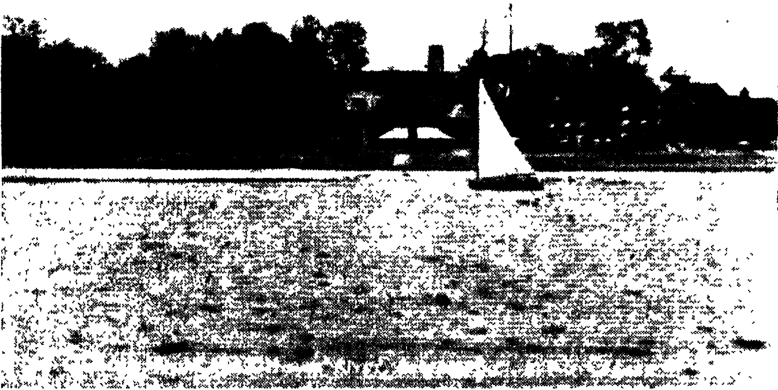
আমরা আহার সেরে হল-কামরায় গিয়ে বসলাম। আমেরিকার বহু খ্যাত-নামা চিকিৎসক ও তাঁহাদের পত্নীদের সঙ্গে এখানে বসে আলাপ পরিচয় হল। আগামীকাল থেকে এইখানে আমেরিকার ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদগণের বাৎসরিক অধিবেশন বসবে। সেই উপলক্ষে প্রায় সকল বিশিষ্ট ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ও স্ত্রীরোগ-চিকিৎসকগণই এখানে সমবেত হবেন। Dr. Taylor-এর ইচ্ছায় আমার স্বামী এই কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে এসেছেন, আমরাও সেই সুযোগে নতুন দেশে বেড়াতে এসেছি।

এই ক্লাবের কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে,—নির্দিষ্টসংখ্যক ক্লাবের সভ্য অথবা তাঁদের পরিচিত অতিথি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ-অধিকার নেই।

১৬ই জুন। প্রাতরাশ সেরে মাঠে বেড়াতে নেমেছি। প্রচণ্ড শব্দমুখর শিকাগো শহরের জনসমুদ্র হ'তে প্রকৃতির এই শোভামণ্ডিত নির্জন নিরালায় এসে আমরা যেন নবজীবন লাভ করলাম; এক দিনের বিশ্রামেই শরীর ও মন বেশ সুস্থ ও শান্ত হয়ে উঠল।

এই ক্লাব প্রাঙ্গণের বহুদূর অবধি কোথাও কোন লোকের বসতি নেই। ক্লাবের কম্পাউণ্ডের ধারেই অটোয়া নদী প্রবাহিত। এ হেন ভীষণ শীতেও নদীবক্ষে নানা রঙের রঙীন Canoe দাঁড় বেয়ে চলেছে। ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় বড় বড় গাছগুলি থেকে থেকে মাতালের মত হেলে ছুলে উঠছে, পাতার মর্মর ধ্বনিতে দিক মুখরিত।

অপূর্ব এই ক্যানাডার আকাশ! সবুজ আস্তরণে ঢাকা পৃথিবীর উপর যেন একখানি ফিকে নীল রঙের চাঁদোয়া টাঙানো।



অটোয়া নদীর তীরে 'লগ শ্যাটু' হোটেল

আজ সারাদিন বেড়িয়ে ও ছবি তুলে কাটালাম। সন্ধ্যার সময় বইপত্তর নিয়ে হলঘরে বসা গেল। হলের চারিদিকে দেওয়ালের ধারে নানারকম কুটীরশিল্প ও Curio-র দোকান রয়েছে, সিলিঙে নানা আকারের কাঠের ঝাড়ে আলোবাতি জ্বলছে। আমরা যখন আলাপ পরিচয়ে ব্যস্ত, তখন দেখি অনেকে খুকুকে ঘেরাও করে বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছেন। 'জয়শ্রী' নামটা উচ্চারণের পক্ষে সুবিধার নয় বলে তাঁরা খুকুকে "জয়"

বলেই ডাক্‌ছেন। Mrs. Pratt-এর (ডেট্রয়েটের খ্যাতনামা স্ত্রী-ব্যাধি চিকিৎসকের পত্নী) কাছে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের Camp life-এর বিবরণ শুনে খুকু তখনই আমায় ধরে বসল ঐ রকম একটি ছোটদের ক্যাম্পে অন্ততঃ ৭ দিনের জন্যও থেকে আসতে হবে।

Mrs. Pratt-এর কাছে শুনলাম, এদেশে শিশু শিক্ষার জন্য এই রকম Camp life-এর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্কুলের ছুটী হলে ছাত্রছাত্রীরা দু'মাস এই ক্যাম্পে কাটায়। সেখানে তারা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ভিন্ন শিক্ষকদের কাছে অন্য বহু নূতন বিষয় শিক্ষা করে। ক্যাম্পে প্রত্যেককেই নিজের কাজ নিজে করে নিতে হয়, টাকাকড়ির হিসাব রাখা হতে আরম্ভ করে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাদের শিখতে হয়। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও স্নেহযত্নে এই বাল্যজীবন হতেই তারা ধীরে ধীরে স্বাবলম্বনের পথে চলতে শেখে ও কালে মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে কবে, কে জানে?

১৭ই জুন। ৮টার সময় উনি মিটিং-এ গেলেন। আমরা মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছি। মেঘের ঘন ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন—এই বৃষ্টি, এই রোদ, এমনি করেই দিনটা কাটছে! মাঠের মাঝে ছেলেমেয়েরা 'সি, স,' চড়ছে ও দোলনায় দুলতে মেতেছে। পাশেই রয়েছে টেনিস খেলার মাঠ। বাগানের আর এক কোণে দেখি, বড় একটি কাঁচের ঘরের ভিতরে Swimming Pool-এ আবালবৃদ্ধবনিতা সাঁতার দিচ্ছে, ঘরটি গরম করা, জলও গরম, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নাই।

১৮ই জুন। হঠাৎ ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছে। জানালার ধারে গিয়ে দেখি, সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তে লাল আলোয় দিক উদ্ভাসিত। সকলকে ঘুম থেকে তুলে সে দৃশ্য দেখালাম। তারপর আবার শয্যা গ্রহণ।

আজ বিকেলে ক্লাবগৃহ সংলগ্ন আরেকটি বাড়ীতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ হয়েছে; এই বাড়ীটির নাম Manor House। Manor House কোন এক ফরাসী ডিউকের বাসগৃহ ছিল। কথিত আছে, Louis XIV ঐ ডিউককে উপহার স্বরূপ এই গৃহটি দান করেন। তখন ক্যানাডায় ইংরাজ ও ফরাসীর আধিপত্য বিস্তার চলেছে। Manor House এখন এই আমেরিকান ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ীটি ফরাসী দেশের আসবাবে

ও শিল্পে সাজানো। চায়ের আসরে বহু খ্যাতনামা ডাক্তার ও তাঁদের পত্নীদের সাথে আলাপ পরিচয় হল। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম।

ডিনারের পর ডাক্তাররা সবাই আবার মিটিংএ যোগদান করতে গেলেন। কেবলমাত্র তাঁদের স্ত্রীরাই হল-ঘরে বসে কথাবার্তায় ও গল্পে-সল্পে আসর জমিয়ে তুলেছেন। রাত প্রায় ১১টার সময় আমি খুকুকে নিয়ে ঘরে শুতে গেলাম; তাঁরা কিন্তু স্বামীদের অপেক্ষায় তখনও ক্লান্ত হয়ে বসে রয়েছেন।



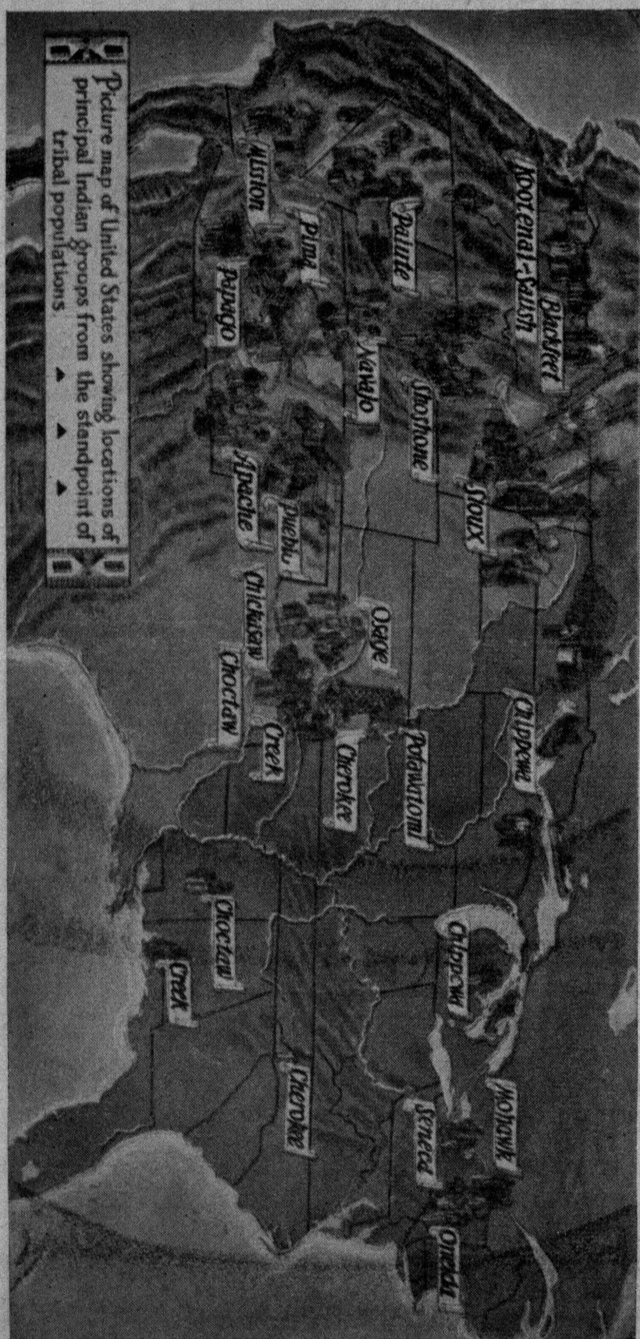
সিনোরি ক্লাব প্রাঙ্গণে (Seignory Club)

১৯শে জুন। আজ মিটিং-এর শেষ দিন। হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় আজ এই বিদায়ের দিনে বড় রকমের একটি সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সবাই অর্থাৎ ডাক্তারদের পত্নী ও পরিবারভুক্ত সকলে নিমন্ত্রিত। হোটেলটির মাটীর নীচে (underground) একটি সাজানো ঘরে আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের প্রধান অতিথি হলেন একজন চীন দেশীয় ডাক্তার। শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা হল। তারপর নানাপ্রকার হাস্যরসে সকলকে খুশী করে সভা ভঙ্গ হল।

২০শে জুন। আজ ভোর থেকেই ডাক্তাররা স্ব স্ব স্থানে ফিরে চলেছেন; হোটেল প্রায় খালি হয়ে গেল। আমরা প্রাতরাশ সেরে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, পরিচিত কয়েকজন ডাক্তার তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে অটোয়া শহর ও আশেপাশে বেড়াতে যাচ্ছেন। যাত্রীর দল বেড়াতে যাবার জন্য আমাদেরও অনুরোধ জানালেন। কিন্তু আমরা বড়ই পথশ্রান্ত; তাই এই চলার পথে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য সারাটা দিন হোটেলে বসেই কাটালাম। বিকেলবেলা ডাক্তার-পত্নীদের কাছে বেড়ানোর গল্প শোনা গেল। কথা প্রসঙ্গে শুনলাম, কিছুদূরে একটি রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটীও নাকি তাঁরা দেখে এসেছেন। এই রেড্ ইণ্ডিয়ানদের জীবন-যাত্রা শুনতে আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্থির হ'ল, আমরাও অটোয়া যাবো।

আমেরিকার অনেকগুলি ষ্টেটে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটীগুলি (Reservation) ছড়ানো রয়েছে। তার মধ্যে Oklahoma, Arizona, New Mexico, South Dakota, North Dakota, California Montana, Washington, Minnesota এবং Wisconsin State-তেই অধিক সংখ্যক রেড্ ইণ্ডিয়ানদের বাস। ঘাঁটীগুলি সর্বতোভাবে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

Red Indian Reservation সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে—এটা বুঝি একটি কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা কোন এক সীমাবদ্ধস্থান, যেখানে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের আটক করে রাখা হয়; বস্তুতঃ তা আদপেই নয়। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের একত্রে বসবাস করার সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্য Federal Government কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান এদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই সকল জমির মালিক হয়েও এদের সরকারকে কর দিতে হয় না। বরং সরকার হতেই এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের ভার বহন করা হয়। তবে এই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়মকানুন তাদের মেনে চলতে হয়। ইচ্ছা করলেই কিন্তু তারা এই সীমানা (Reservation) চিরদিনের মত ত্যাগ করে চ'লে যেতে পারে; প্রকৃতপক্ষে এখন হচ্ছেও তাই—শত শত রেড্ ইণ্ডিয়ান তাদের Reservation ছেড়ে দিয়ে অন্যস্থানে স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জন করছে এবং অন্য নাগরিকদের মত সুখে বাস করছে।



আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের বসতি

এই রেড্ ইণ্ডিয়ানরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত। এখন দেখা যায় ১০০টি উপজাতি। তাদের কথ্যভাষা ৪০টি। প্রত্যেক রেড্ ইণ্ডিয়ানকেই কোন না কোন একটি উপজাতীয় দলের সভ্য হতে হয়। তারা যদি Reservation ত্যাগ করে, তবে তাদের দলচ্যুত হতে হয় এবং জমির মালিকী-সত্বও হারায়। ওক্লাহোমাতে রেড্ ইণ্ডিয়ানের মধ্যে একদল আছে যারা বেদের ন্যায় ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে; তাদের পরিধানে কম্বল দেখা যায় বলে "Blanket" Indian বলা হয়।

সারা আমেরিকায় মোটামুটি এখন এই রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা হল প্রায় চারি লক্ষ। কলম্বসের আমেরিকা পদার্পণ কালে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। ১৬০০ সাল থেকে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের লোকসংখ্যা কমতে দেখা গেছে। তারপর ৩০০ বৎসরের মধ্যে এত অধিক লোক ক্ষয় হয়, যে শেষে মাত্র দুই লক্ষ সত্তর হাজারে দাঁড়ায়। California-য় এক সময় প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার রেড্ ইণ্ডিয়ান বাস করত। অনশনে, রোগে ও শ্বেতপ্রভুদের নৃশংস হত্যায় কমে কমে এরা শেষে দাঁড়ায় মাত্র বিশ হাজারে; এখন আবার কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯২৪ সালে কংগ্রেস থেকে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়; সেই হতে প্রায় সকল ষ্টেটেই এরা ভোটাধিকার পেয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদের সামাজিক জীবনও উন্নত হতেছে। নানান কাজে এদের খুবই যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখা গিয়েছে। এবার এই যুদ্ধে প্রায় পঁচিশ হাজার রেড্ ইণ্ডিয়ান বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সৈনিকের কাজ করেছে এবং আরও প্রায় চল্লিশ হাজার ইণ্ডিয়ান যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে রকমারি কাজে সহায়তা করেছে।

ব্যবসাক্ষেত্রে এদের খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে শ্বেতপ্রভুরা নামমাত্র মূল্য দিয়ে এদের জমি ক্রয় করে নিত; এখন কিন্তু এ বিষয়ে এরা যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতন। জমি বিক্রয় করলেও এরা ভূগর্ভস্থ খনিজ-দ্রব্যের স্বত্বাধিকার ছাড়ে না বা বিক্রয় করে না। ওক্লাহোমাতে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে Osage উপজাতি তাদের জমির নীচে তেলের খনির সন্ধান পায় এবং সেই খনির তেল বিক্রয় ক'রে এখন তারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসেছে।

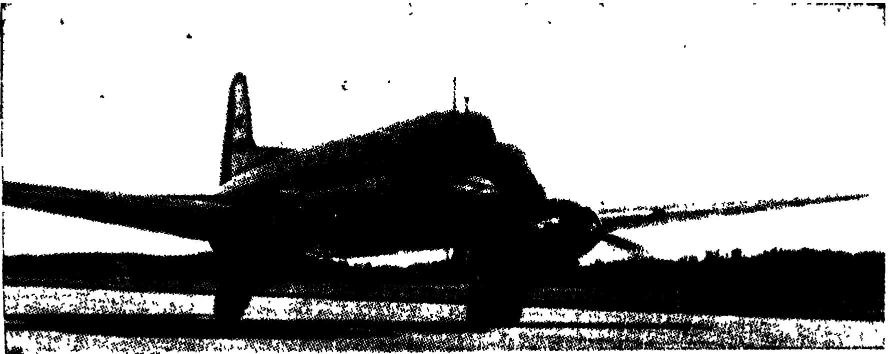
২১শে জুন। ভোর ৫টায় ট্যাক্সি করে আমরা অটোয়া রওনা হলাম। যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথে না ফিরে সুন্দর চওড়া রাস্তা দিয়ে চলেছি, সামনেই অটোয়া শহর। অটোয়া শহরটি খুব বড় নয় কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শহর ঘুরে আমরা বিমানঘাঁটির দিকে চলেছি। চোখে পড়ল মাঠের মাঝে একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ বাঁধা; মঞ্চটি ঘিরে হাজার হাজার চেয়ার পাতা। প্রবেশদ্বারের সামনেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের একটি বিরাট মূর্তি স্থাপিত। রাস্তার দুধারে দলে দলে খৃষ্টীয় সন্নাসী ও সন্ন্যাসিনীরা তদ্গতচিত্তে ও প্রশান্তবদনে চলেছেন। প্রার্থনারত ভক্তবৃন্দের মাঝে দাঁড়িয়ে মন ক্ষণেকের তরে স্থির হয়ে যায়। এক রকম পোষাক-পরা অসংখ্য পুরোহিতের দল দেখতে দেখতে আমরা ফিরে চলেছি। শুনলাম, পৃথিবীব্যাপী একটি বিরাট খৃষ্টীয় ধর্মসভার অধিবেশন এখন এইস্থানে চলেছে, তাই সারা বিশ্ব হতে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ 'অটোয়া'য় এসে সমবেত হয়েছেন।

আমরা বিমানঘাঁটীতে পৌঁছে T. C. A-এর বিমানে উঠলাম। যাত্রা সুরু করে মাঠের শেষ প্রান্তে এসে বিমান তর্জন গর্জন করে শূন্যে ওঠার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ১৫ মিনিট ধরে হুঙ্কারধ্বনি করেই চলেছে, বিমান আর আকাশে ওড়ে না। এমন সময় ষ্টুয়ার্ডেশ এসে খবর দিল যে বিমানের যন্ত্র বিকল হবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করে চালকগণ এখুনি বিমানখানি ঘুরিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে যাবেন এবং এ বিমান পরিত্যাগ করে আমাদের অপর একটিতে যাত্রা করতে হবে।

আমরা নেমে বিমানঘাঁটীর বসবার ঘরে ঢুকলাম। যা হোক, শেষ অবধি আরেকটি বিমানে তো ওঠা গেল। বিমান আকাশে সোঁ সোঁ শব্দে উড়ছে, আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসে আছি। একটু পরেই অনুভব করলাম— ছোট ছোট Air Pocket-এ পড়ে বিমান নাগর দোলার মত দুলছে; জানলায় তাকিয়ে দেখি—কালো মেঘের ঘন ঘোর ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন। পরক্ষণেই সুরু হল ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমকানি।

আমরা ঝড়ের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে সুরু করলাম; আমি তো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এ যাত্রায় আর আমাদের রক্ষা নেই।

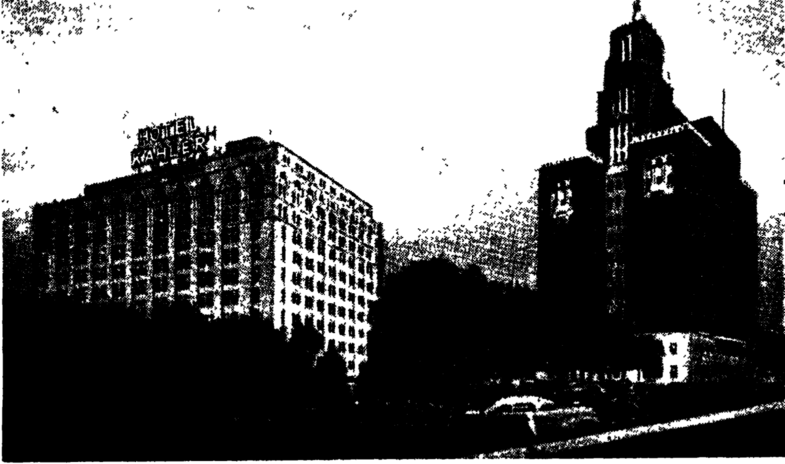
লাঞ্চ খাওয়া তো দূরের কথা, চেয়ার থেকে আর মাথাই তুলতে পারলাম না। যাহোক্, শেষে বেলা ৫টায় শিকাগোর মাটীতে ত বিমান নেমে দাঁড়াল। আমরা Hotel Palmer House-এ গিয়ে একটু বিশ্রাম করলাম।



বারো

রচেষ্টার—মেয়ো ক্লিনিক

আজই আবার রাত ৯টার ট্রেনে Minnesota State-এর রচেষ্টারে যাবার কথা। সারারাত ট্রেনে আরাম করে ঘুমোনো গেল। ট্রেনের একজন নিগ্রো তত্ত্বাবধায়ককে বলে রাখলাম সকালে রচেষ্টার পৌঁছবার পূর্বেই আমাদের জাগিয়ে দিতে।



মেয়ো ক্লিনিক ও হোটেল কেলার

ভোর ৬টায় দরজায় ধাক্কা; তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। প্রাতরাশ সারতে খাবার ঘরে গিয়েছি, ফিরে এসে দেখি আমাদের জিনিষপত্তর সব যথাস্থানে গোছানো রয়েছে, শোবার বিছানাকে বসবার সোফায় পরিণত করা হয়েছে। আমরা ৮টার সময় রচেষ্টারে পৌঁছে Hotel Khaler-এ উপস্থিত হলাম; আবার সেই Sky-scraper-এর মাথায় ওঠা। পুরো একটি ব্লক জুড়ে চারটি রাস্তার মাঝে এই হোটেল।

রচেষ্টার শহর বিশ্ব বিখ্যাত Mayo Clinic-এর জন্য প্রসিদ্ধ। সারা আমেরিকাবাসী এই ক্লিনিকে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আসে।

আমরা পথে বেরিয়ে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য! শহর কেবল রোগীর ভিড়ে ভর্তি—মাঠে, পথে, দোকানে, রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, হোটেলে, সর্বত্রই কেবল রোগী আর রোগী। এই শহরটিতে রোগীদের জন্য কি অদ্ভুত বন্দোবস্তই না রয়েছে! এরোড্রম থেকে আরম্ভ করে শহরের ভিতরে সর্বত্রই রোগীদের জন্য যথাযথ প্রয়োজনীয় জিনিষ, এমন কি ষ্ট্রেচারেরও বন্দোবস্ত সকল সময় রয়েছে। রোগীদের ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবার জন্য মাটীর তলায় সুন্দর বাঁধানো চওড়া সুড়ঙ্গপথ রয়েছে, সেই পথে দুধারে আবার রোগীদের জন্য ছোটখাট দোকানও কিছু কিছু রয়েছে। বড় বড় হোটেলের বাড়ী থেকে মাটীর নীচে দিয়ে এই রকম সুড়ঙ্গপথ সোজা ক্লিনিক অবধি বরাবর চলে গেছে। হোটেলে ডাক্তার ও নার্স রোগীদের জন্য সদাই মজুত। যে কোন রোগী তার ঘর থেকে অফিসে খবর দিলেই নার্স ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রয়োজন হলে রোগীকে ঠেলা গাড়ীতে ঠেলে সোজা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে যায়।

শহর ঘুরে কেবল রোগী দেখে মনে হচ্ছে,—এ যেন কোন এক হাসপাতালের রাজত্বে এসে পড়েছি। আমাদের মত সুস্থ দেহীর পক্ষে এ রকম স্থান যেমন নিরানন্দের, তেমনিই অসহ্য কষ্টকর। চারিদিকে শুধু বিরস ও বিকৃতমুখাবয়ব। রোগীর দৃশ্য দেখে দেখে মনে হচ্ছে আমি নিজেই বুঝি রোগী হয়ে পড়ছি।

২৩শে জুন। সকালে আমরা মেয়ো-ক্লিনিক দেখতে গেলাম। উনি সেখানে সমব্যবসায়ীদের পেয়ে কথাবার্তায় বেশ জমে গেলেন। অগত্যা আমরা একজন মেট্রনের সাহায্যে সারা হাসপাতালটি ঘুরে দেখতে গেলাম। এই ক্লিনিকের কর্ম-পদ্ধতি ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা বেশ একটু নূতন ধরণের, সাধারণ হাসপাতালের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

এখানকার বিশেষত্ব হল—রোগী ভর্তি হ'লে প্রথমেই তার সব রকম প্রাথমিক পরীক্ষা, মায় দেহযন্ত্রের এক্সরে ছবি পর্যন্ত করিয়ে নেওয়া হয়। তারপর রোগীর কোনও বিশেষ অসুখ আছে সন্দেহ হলে, তাকে সেই বিভাগে পুনঃ পরীক্ষার্থে পাঠানো হয় এবং প্রয়োজন হলে আরো বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়ে তার দেহে ব্যাধির আক্রমণের প্রকোপ কতটা, তা' যথাযথ পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়। তারপর ক্লিনিকের সমস্ত

ডাক্তারেরা একত্রে মিলিত হয়ে এই সকল পরীক্ষার ফল বিচার করে রোগীর রোগ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া জরুরী রোগীর চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা তো সর্বদাই মজুত থাকে। ক্লিনিকে দৈনিক প্রায় দেড়শ, থেকে দু'শ' রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং দৈনিক প্রায় দুই হাজার রোগীকে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা করা হয়।

ক্লিনিকের এই গগনস্পর্শী অট্টালিকার মধ্যে অসংখ্য Elevator-এ করে রোগীর দল ক্রমাগত ওঠানামা করছে। এক একটি তলায় রোগীর দেহের এক এক অংশ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা Elevator-এ



রচেষ্টার শহরের রাজপথে

করে উঠে বিভিন্ন বিভাগের কর্ম-ব্যবস্থা দেখলাম। প্রত্যেক তলায় রোগীর দল হলঘর জুড়ে বসে অপেক্ষা করছে; তাদের সামনেই রয়েছে নার্সের ডেস্ক—সেখানে নার্সরা রোগীদের কাগজপত্তর ও তালিকা নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যস্ত। এতবড় বিরাট হাসপাতালে কাজ চলেছে অতি নীরবে ও নিঃশব্দে।

এই মেয়ো ক্লিনিকের নামটির সাথে ছোট্ট একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। Dr. William Mayo-র নামেই এই ক্লিনিকের নাম। Dr. William Mayo একজন অতি সাধারণ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি এক সময় এই রচেষ্টারে এসে চিকিৎসা প্রসারের জন্য বসবাস করাতে সুরু করেন; তখন রচেষ্টার শহর নয়, সামান্য একটি পল্লী মাত্র।

সেই সময়ে একদিন দেশে হঠাৎ দেখা দিল প্রবল বন্যা, দেশ ভাসলো জলে। দরিদ্র পল্লীবাসীরা গৃহহারা হ'য়ে অনাহারে রোগে ও বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাতে লাগল। দেশের এই দুর্দিনে Dr. William Mayo-র মহৎ প্রাণ সাড়া দিল বিশ্বমানবের কল্যাণের ডাকে। তিনি সেই বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীদের আশ্রয় দিলেন নিজের ছোট্ট কুটীরখানিতে। স্বহস্তে তাদের সেবা, যত্ন ও চিকিৎসা করে পুনর্জীবিত করে তুলতে লাগলেন। সেই হতে তাঁর বাসগৃহেই সুরু হল তাঁর ছোট্ট একটি ক্লিনিকের কাজ। মানব সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে শেষের দিনে দিয়ে গেলেন তাঁর জীবনের সমুদয় স্বোপার্জিত অর্থ এই ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্রও চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করে পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ক্লিনিকের কাজেই আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁদের জীবনের যাবতীয় অর্থ মায় বসত-বাটীটি পর্যন্ত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এই ক্লিনিকের কাজে দান করে গেছেন।

যে আমেরিকাকে আমরা 'ভোগী'র চক্ষে দেখেছি, সেই আমেরিকাতেই এমনি কত ত্যাগী মহামানবের জন্ম হয়েছে। রকেফেলার ও কার্ণেগীর দানে পৃথিবী আজ সমৃদ্ধ। দীর্ঘ শতাব্দীর পর আজও তাঁদের সেই অক্ষয় কীর্তি জগতের আদর্শস্বরূপ হয়ে আছে।

আজ পৃথিবীব্যাপী কত পীড়িত ও ব্যধিগ্রস্ত নরনারী এই ক্লিনিকে এসে রোগমুক্ত হয়ে—মেয়ো পরিবারের নামে মাথা নত করে বিদায় নিচ্ছে।

২৪শে জুন। সকালে আমরা বেড়াতে বেড়াতে একটি পার্কের মধ্যে একটি মিউজিয়াম দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম মিউজিয়ামটির ভিতরে কাঁচের শোকেসে সাজানো রয়েছে—আগাগোড়া প্লাসটিকের তৈরী অস্ত্রোপচারিত মানব দেহ। অস্ত্রোপচার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত দেহের প্রতি অঙ্গের অস্ত্রোপচার পদ্ধতিটি, ছুরিবসানো হতে আরম্ভ করে শেষ সেলাই করা পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমে অতি সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে; দেখে মনে হল যেন জীবিত মানবদেহের অস্ত্রোপচার দেখছি। একটি মানুষ প্রমাণ প্লাসটিকের মূর্তি দেখলাম,—স্বচ্ছ দেহের ভিতরে সকল রকম যন্ত্রগুলি ও তাদের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। দেখে ভারী আশ্চর্য ও অদ্ভুত লাগল।

আজ দুপুরে Dr. Mussy-র বাড়ী নিমন্ত্রণ সেরে বাক্স গুছিয়ে ম্যাডিসন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

Minnesota State-এর রাজধানী ম্যাডিসন।



রচেষ্টারের অপারেশন মিউজিয়াম

রাত প্রায় ১১টায় আমরা ম্যাডিসনের বিমানঘাঁটীতে নামলাম; সামনেই দেখি Dr. ও Mrs. Campbell (স্থানীয় ডাক্তার) আমাদের নিতে এসেছেন। এঁদের সাথে আলাপ হয়েছিল ক্যানাডার Seignory Club-এ। বিমানঘাঁটীতে বাক্স তোলার লোক নেই দেখে আমরা নিজেরাই বাক্স বয়ে গাড়ীতে তুলতে লাগলাম। ফিরে দেখি ডাক্তার ও ডাক্তারপত্নী দু'জনেই আমাদের বাক্স বহনের কাজে লেগে গেছেন। লজ্জা পেলাম নিজেদের বাক্সর বহর দেখে। লম্বা পাড়ি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল ছিল না যে ওগুলোও আকারে ও সংখ্যায় এতটা বেহিসেবী ভাবে বেড়ে গেছে। এ যেন আমাদের ভ্রমণের একটা অভিশাপ।

২৫শে জুন। সকালে উঠে Mrs. Campbell-এর তৈরী প্রাতরাশ খেয়ে বাগানে বেড়াতে গেলাম। Dr. Campbell ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। এই হাসপাতালে একটি ক্যানসার রোগীকে অপারেশন করবার জন্যই Dr. Campbell ওঁকে এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

Mrs. Campbell-এর নিজের হাতে তৈরী করা এই বাগানখানি ফুলে ফুলে ভরে আছে। বাড়ীখানি ছবির মতন; ঘরগুলি অতি মনোরমভাবে সাজানো। Mrs. Campbell-এর শিল্পজ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধ সত্যই প্রশংসনীয়।

এ দেশে গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসী নেই; তাই স্বামীপুত্রের কাজ ও যাবতীয় গৃহস্থালীর কাজ গৃহিণীকে নিজেই করে নিতে হয়। আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে Mrs. Campbell-এর ঘরকন্নার কাজ দেখতে লাগলাম। ছোট্ট একটি সংসার পাতা, সুন্দর নিপুণ হাতে ঘর সাজানো। সংসারের কাজের সুবিধার জন্য কত রকম যন্ত্রই না ব্যবহার করা হয়। মাটীর নীচের তলায় ঘরগুলিতে গৃহস্থের যাবতীয় সাংসারিক খুঁটীনাটী কাজকর্ম হয়,—সেখানে রয়েছে ঠাণ্ডাগরম জল সরবরাহের যন্ত্রটি, কাপড় কাচার জন্য বৈদ্যুতিক কল, ইস্ত্রিকরার যন্ত্র ও সুন্দর সাজানো ভাঁড়ার ঘরে Deep Freeze যন্ত্রটি পর্যন্ত। এই Deep Freeze গৃহস্থের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। এর ভিতরের তাপ—২০° ডিগ্রি; এতো অধিক ঠাণ্ডা বলে এর ভিতরে খাদ্যদ্রব্য অপরিবর্তিত অবস্থায় বহুদিন অবধি থাকে। সুতরাং, রোজ জিনিষপত্তর কেনার হাঙ্গামা কমিয়ে গৃহিণীরা কয়েক মাসের খাদ্যদ্রব্য একবারে কিনে এর ভিতরে নিশ্চিন্ত মনে রেখে দেন। বাড়ীর ব্যবস্থা এত উৎকৃষ্ট ও সুবিধাজনক বলেই একা গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সকল দিকের কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

বেলা প্রায় ১টার সময় Dr. Campbell এবং উনি ফিরে এলে আমরা বাইরে লাঞ্চ খেতে গেলাম। Dr. Campbell আমার স্বামীর সফল অপারেশনের জন্য আমাকেই অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ফেল্লেন। এখানকার ডাক্তাররা নাকি সেই অস্ত্রোপচার দেখে অতিশয় উৎসাহিত হয়েছিলেন, সেইসকল গল্প সবিস্তারে করলেন। শুনে খুশী ও গর্বিত যে হইনি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। লাঞ্চের পর আমরা

ম্যাডিসন সহর ঘুরতে বেরোলাম। ম্যাডিসনে ছোট ছোট বহু হ্রদ রয়েছে; শহরটায় যেন অর্ধেক জল ও অর্ধেক স্থল।

আজ রাতে Dr. Campbell একটি বড় রকমের ভোজের আয়োজন করে শহরের ডাক্তারদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা স্থানীয় ডাক্তার ও ডাক্তার-পত্নীগণের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবেন।

আমাদের মত বেরসিকদের জন্য আজ রাত্রে ভোজের টেবিলে দ্রাক্ষারসজাত পানীয় নিষিদ্ধ করে শুধু মিষ্টি সরবৎ পরিবেশন করেই অতিথিদের তৃপ্ত করা হল। রাত প্রায় ১১টা অবধি খাওয়া দাওয়া ও গল্পগুজব করার পর ভোজপর্ব শেষ হল।

পরদিন সকালে উঠে প্রাতরাশ খেয়ে আমরা ১০টার ট্রেণে শিকাগো ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলাম। Dr. ও Mrs. Campbell ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় আমরা শিকাগো পৌঁছলাম। আবার সেই Palmer House Hotel-এ ওঠা।

শিকাগোর Grant Park-টি বেশ বড়; দেখে কলিকাতার ময়দানের কথা মনে হল। পার্কের মাঝে প্রকাণ্ড একটি ফোয়ারা হতে ঝরণার জল বহু ঊর্ধ্বে শূন্যে উঠে যেন আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার সময় রঙীন আলো তার ভিতরে জ্বলে উঠলে, জলের ফোয়ারা এক রঙের-ফোয়ারায় রূপায়িত হয়।

কিছুক্ষণ রঙের খেলা দেখে আমরা হোটেলে ফিরছি, পথে একটি ভারী মজার প্রশেসন রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম। প্রশেসনের সামনের লোকেরা কাঠবেড়ালির গলায় সুতো বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, তার পিছনের দল এক গোছা কাঁকড়া হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে যাচ্ছে। আর তার পিছনে চলেছে মূল্যবান পোষাকপরা বাজনদারের দল। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রশেসনের লোকেরা হাসি খুশীর পরিবর্তে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ভাবেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। এ প্রশেসনের অর্থ কি? কেনই বা রাস্তায় বেরিয়েছে, কিছুই বুঝলাম না।

এখানে এসে দেখছি, এ দেশের মানুষরা কি অদ্ভুত বিকৃত সাজে সেজে গুজে রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা করে! দেখে হাসি চাপা দায়, অথচ এরা

নিজেরা কিন্তু এই বিকৃত ফ্যাশানের নূতনত্বের বাহাদুরিতে এবং তার সৌন্দর্যের গর্বে মহা গর্বিত। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের মাথায় অদ্ভুত আকারের টুপী ও হাতে বিকৃত আকারের 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। দেখে আমার মনে হল—নারীত্বের শোভা ও কোমল হাতের সৌন্দর্যকে ব্যঙ্গ করে এদের সাজ পোষাকের বিকৃত রুচিটাই উৎকটরূপে প্রকটিত হচ্ছে।

রাতের আহার সেরে আবার আমরা Grant Park-এর খোলা মাঠে বসে কনসার্ট শুনতে গেলাম। মাঠ জুড়ে চেয়ার পাতা, প্রকাণ্ড একটা ষ্টেজের ভিতরে কনসার্ট বাজছে, আর বড় বড় লাউডস্পীকারের ভিতর দিয়ে সারা মাঠে সেই সুর ছড়িয়ে পড়ছে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর শহরের লোক মাঠে শুয়ে বসে আরাম করে সঙ্গীত উপভোগ করছে। কনসার্ট শোনার পর হোটেলে ফিরে হল-ঘরে ঢুকেই দেখি, সামনে এক ভদ্রলোকের গলায় 'বো'তে দু'দিকে লাল ও সবুজ দু'টি আলো জ্বলছে। কৌতূহল বশতঃ তাকিয়ে রইলাম; শেষে তিনি আরো নিকটে এলে দেখি যে তাঁর গলায় বাঁধা নীল রংএর একটি বো'তে একদিকে লাল আলো ও অপরদিকে সবুজ আলো জ্বলছে, আলোর ব্যাটারিটা নিশ্চয় গলার কলারের ভিতরে লুকানো আছে। ফ্যাশানের চরম উৎকর্ষ দেখলাম বটে!

২৮শে জুন। আজ বেলা দু'টায় শিকাগোর Planetarium-এ গেলাম। একটি গোল ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে চালিত সৌরমণ্ডলীর ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি দেখানো হচ্ছে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আমরা আরেকটি উঁচু গোলছাদওলা ঘরে গিয়ে বসলাম; দরজা বন্ধ করে ঘরটি অন্ধকার করা হল। দেখতে দেখতে অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র আকাশের ঘন অন্ধকারের মাঝে ফুটে উঠল। চাঁদ উঠল ধীরে ধীরে; আকাশের রহস্যময়ী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। আজকের বক্তব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় হল চন্দ্রগ্রহণ। একজন বক্তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিচ্ছেন। ঘণ্টা দেড়েক পরে বক্তৃতা শেষ হ'লে আমরা বেরিয়ে এসে সামনের খোলা মাঠে বসলাম। খুকু কাছেই একটি Aquarium দেখতে গেল।

বিকেলে স্থানীয় এক মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রথমেই আমাদের খারাপ লাগল মনস্তত্ত্ববিদের মনোভাবটা দেখে, তাঁর

কথাবার্তা কেমন যেন বেখাপ্পা ধরণের। বুঝলাম, মানুষের মন বিশ্লেষণ করে করে মনস্তত্ত্ববিদ্ নিজের জীবনের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ-রূপটি হারিয়ে কেমন এক বিকৃত মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডাক্তারপত্নী কিন্তু অতি স্বাভাবিক, সরল ও সাদাসিদা মানুষ। শুনলাম, তাঁরা দু'জনে এসিয়া ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। ডাক্তারের সূক্ষ্ম বিচারে সকল দেশের ও সকল জাতির নরনারীর বিকৃত বিশ্লেষণই কেবল চলতে লাগল;



বিশ্ববিশ্রুত Parliament of Religion প্রাঙ্গণ

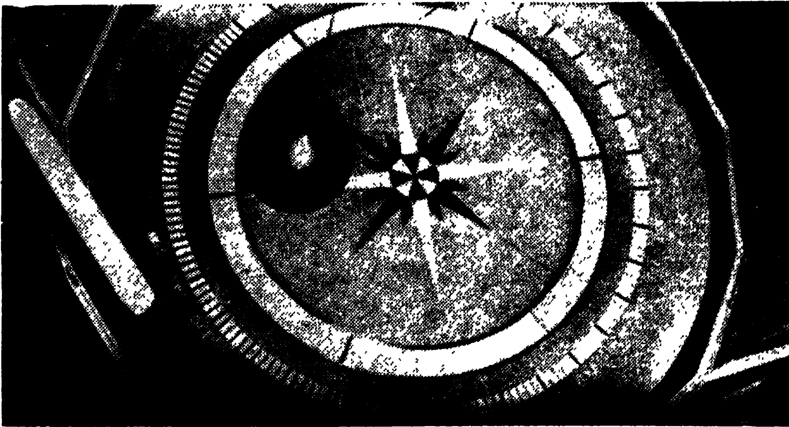
ক্রমে কথাবার্তা তর্কে পরিণত হল। ডাক্তারের স্ত্রী স্বামীকে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করে দু'তিন বার ধমক ও চোখ রাঙানি পেলেন। শেষবারে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে এমন এক ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—"You shut up, Darling" যে, স্ত্রী বেচারার মুখখানি লজ্জায় ও অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠলো।

আমার ভারি খারাপ লাগল। বায়স্কোপ যাবার সময় হয়েছে বলে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ডাক্তার-পত্নীকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমার বার বার মনে হতে লাগল,—আমেরিকার মত প্রগতিশীল স্বাধীন দেশেও এই রকম রুক্ষ মেজাজী স্বামীর এই কদর্য রূঢ় ব্যবহার সহ্য করেও স্ত্রী তাহ'লে ঘর করেন! তবে একথা সত্য যে তিনি 'Darling' বলতে কিন্তু ভুল করেন নি।

আজ সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাটা বেদনাদায়ক হ'লেও বেশ একটু নূতন ধরণের হল।

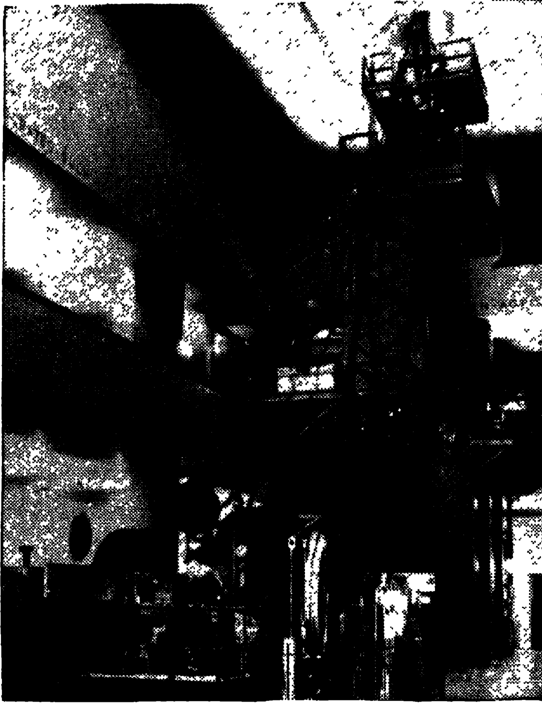
২৯শে জুন। ডেট্রয়েট যাবার দিন। সকালেই গেলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজীর সাথে দেখা করতে। তিনি এক শিষ্যের গাড়ীতে করে আমাদের শহর বেড়াতে নিয়ে গেলেন। শিকাগোর শেষ সীমানা ঘুরে North Western University দেখে আমরা Museum of Science and



ফোকাল্ট পেণ্ডুলাম

Industry-র বাড়ীর কাছে নামলাম। স্বামীজী নেমে সামনের মাঠটি দেখিয়ে বললেন যে, বিশ্ববিশ্রুত Parliament of Religions-এর অধিবেশন এক সময় সেই জায়গাটিতেই হয়েছিল। সেদিন স্বামী শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ ভিক্ষুকের বেশে এসে কত ক্লেশ সহ্য করে আমেরিকার এই মাটীতে ভারতের ধর্ম-পতাকা প্রোথিত করে গেছেন। যুবক সন্ন্যাসী বিশ্বের ধর্মসভায় শুনিয়েছিলেন ভারতবাসীর ধর্ম কি এবং ভারতের গৌরব কোথায়?

আমরা হোটেলে ফিরে আহারাদি সেরে আবার এলাম Museum of Science and Industry দেখতে। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সাথে শিল্পের উন্নতি সাধন কি অভাবনীয়ভাবে হচ্ছে এবং মানুষ তদ্দ্বারা কত উপকৃত হচ্ছে, সেই সকল নিদর্শনই এখানে সাজিয়ে রেখে দেখানো হয়েছে। বাড়ীর একধারে একটি প্রকাণ্ড পেণ্ডুলাম বিশ তলা পরিমাণ উঁচু ছাদ হতে ঝোলানো



মিউজিয়ামের ভিতর নকল কয়লার খনি

রয়েছে দেখলাম। পেণ্ডুলামের তলায় দাগকাটা বড় একটি বোর্ডে ছক পাতা। পেণ্ডুলামটি দিনরাতে একবার গোল হয়ে ঘুরে আসে এবং পৃথিবী যে ঘুরছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দেয়।

মিউজিয়ামের বড় হলটির মাঝে একটি ছোট কয়লার খনি তৈরী করা আছে। আমরা টিকিট কেটে সেই কয়লার খনির ভিতরে lift-এ করে নামলাম। খাদের ভিতরে ছোট্ট একটি ট্রলির মত ট্রেনে চড়ে এক খাদ হতে

আরেক খাদে গিয়ে দেখতে লাগলাম, খাদের ভিতরে যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর কয়লা কাটা হচ্ছে, আবার যন্ত্রের সাহায্যেই গাড়ী বোঝাই হয়ে যাচ্ছে এবং সোজা উপরে উঠে আসছে। আমাদের দেখা শেষ হলে ট্রেন থেকে নেমে একটু হাঁটতেই দেখি, basement-এর একটি ঘরে পৌঁছে গিয়েছি। পাশের ঘরটি একটি Cafetria, সেখানে লোকেরা সব ঠাণ্ডাগরম পানীয় খাচ্ছে।

আমরা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে বাসে চড়ে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। বাস নিগ্রোপল্লীর ভিতর দিয়ে চলল। দেখতে দেখতে নিগ্রো মেয়ে পুরুষে বাস ভরে গেল। শিকাগোর এই নিগ্রোপল্লীটির আয়তন অনেকখানি; নিগ্রোসংখ্যা এখানে সর্বাপেক্ষা অধিক। মাইলের পর মাইল আমরা নিগ্রোপল্লী পেরিয়ে চলেছি। ছোট ছোট একধরণের সাজানো দোতলা বাড়ীগুলি দেখতে বেশ।

নিগ্রো নরনারীর দেহাকৃতি যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। একে বিরাটকায়, তার উপর আবার এরা শাদা আমেরিকানদের বেশভূষা হুবহু নকল করে রং চড়িয়ে সেজে গুজে চমক লাগিয়ে চলেছে!

আমেরিকায় লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাদায় কালোয় বর্ণসঙ্কর দেখা দিয়েছে। শতকরা ৫৪ জন এখন মিশ্র জাতীয়।

আমরা হোটেলে পৌঁছে মালপত্র নিয়ে ডেট্রয়েটের ট্রেণ ধরতে ষ্টেশনে গেলাম। সারা রাত ট্রেণে কাটল, সকাল ৮টায় ডেট্রয়েটে নামলাম।



নায়গ্রা জলপ্রপাত

তের

ডেট্রয়েট

ষ্টেশনে নেমে দেখি Dr. Pratt আমাদের নিতে এসেছেন ; তাঁর গাড়ীতে করেই তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। Mrs. Pratt আমাদের দেখে খুব খুশী। তিনি খুকুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন একটি ছোট্ট সাজানো খেলা



ডেট্রয়েতে ডাক্তার প্রাট পরিবারের সাথে

ঘরে। ঘরের সাজানো খেলনাগুলি দেখিয়ে বল্লেন, সে ঘরের সব খেলনাই তার, এমন কি ঘরখানিও তার দখলে। Mrs. Pratt-এর বৃদ্ধা মা ও একমাত্র বিবাহিতা কন্যা—Patracia-ও বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীতে দাসদাসী তিন চারজন রয়েছে। Mrs. Pratt আমাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বাড়ীর সব দেখালেন ; তাঁদের family drawing-room-এ গিয়ে একটি লম্বা আরাম-সোফা টেনে দিয়ে সুন্দর একটি খাট তৈরী করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা তার উপর করে দিলে আমার কষ্ট হবে কিনা। Mrs. Pratt-এর বয়স অনুমান ৫০ এর উর্দ্ধে ; এই বয়সে তাঁর এই অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে আমি একেবারে অবাক।

আমরা একটু বিশ্রাম করে সবাই মিলে তাঁর ফুলের বাগান দেখতে গেলাম। বাগান লাল গোলাপে ভরে আছে; কাদামাটীর পাশে লাল মাটীতে গোলাপ গাছের সারি পোঁতা, দেখে বেশ আশ্চর্য লাগল। Mrs. Pratt তাঁর এই সখের বাগানটি দেখিয়ে আমায় বল্লেন,—আমেরিকাতে কতকগুলি কোম্পানী আছে যারা বাড়ীর বাগান সুন্দররূপে সাজিয়ে তৈরী করে দিয়ে যায়; যে গাছের জন্য যে ধরণের মাটী ও সার প্রয়োজন, সমস্ত কিছুই তারা সরবরাহ করে এমনি একটি সখের বাগান তৈরী করে দিয়ে যেতে পারে। আমেরিকার অন্য শহরের মত ডেট্রয়েটও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো বড় শহর। ফোর্ড কোম্পানীর মোটর কারখানার জন্যই শহর এত বড় হ'য়ে গড়ে উঠেছে।

Dr. Pratt ওঁকে হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গেলেন। Patracia খুকুকে তার সাইকেলের সামনে বসিয়ে শহর ঘোরাতে নিয়ে গেল, আমরা সবাই বসলাম বাগানে। বাগানের সামনে খোলা সবুজ Golf খেলার মাঠ, চারিদিকে সাজানো বাগান, মাঝে বাড়ীটি—যেন তুলি দিয়ে আঁকা ছবি।

Mrs. Pratt-এর রান্নাঘরে একটি নূতন জিনিষ দেখে আমার ভারি ভালো লাগল—রান্নাঘরের যাবতীয় আবর্জনা একটি টানা দেরাজের ভিতর পুরে বন্ধ করে দিলেই সব ইলেকট্রিকে পুড়ে ছাই হয়ে নীচের basement-এর একটি ঘরের কোণায় গিয়ে পড়ে।

দুপুরে সবাই ফিরলে বাড়ীতে লাঞ্চ খাওয়া গেল। Mrs. Pratt আবার আজ রাতে বাড়ীতে একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় ডাক্তার পরিবারদের সাথে আমাদের আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে। রাত বারোটা অবধি সকলের সাথে আলাপে ও গল্পে কাটল।

পরদিন সকালে Ford গাড়ীর কারখানা দেখতে গেলাম। Patracia তার মস্ত মোটার হাঁকিয়ে আমাদের শহর ঘুরিয়ে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেল। এত বড় বিরাট কারখানা আমি আগে কোথাও দেখিনি—যেন অনেকগুলো শহর জুড়ে এই কারখানাটা গড়েছে। আমরা ফিরে এসে বাক্স গুছিয়ে যাত্রার জন্য তৈরী হলাম। আজই আমাদের বাফেলো যেতে হবে।

Dr. Pratt ষ্টেশনে তুলেদিয়ে গেলেন।

চৌদ্দ

বাফেলো—নায়াগ্রা

আমরা রাত প্রায় ৯টায় বাফেলো ষ্টেশনে নামলাম। Hotel Statler একটি বিরাট গগনস্পর্শী অট্টালিকা, ঘরগুলি জাঁকজমকের চূড়ান্ত সাজে সাজানো, প্রত্যেক ঘরে রেডিও সেট পর্যন্ত রয়েছে।

একটু পরে General Electric থেকে একজন অফিসার ও তাঁর স্ত্রী—Mr. ও Mrs. Nelson—আমাদের খোঁজে হোটেলে উপস্থিত হলেন। আমাদের সাথে আলাপ পরিচয় হল, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থির হল কাল তাঁরা আমাদের নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাবেন।

২রা জুলাই। সকালে ওঁর সেই যথারীতি হাসপাতাল পরিদর্শন শেষ হলে আমরা সবাই Mr. ও Mrs. Nelson-এর গাড়ীতে করে নায়গ্রা জলপ্রপাতের দিকে রওনা হলাম। ঝরণাটি এখান থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে।

বাফেলো শহর Erie হ্রদের পাড়ে। এই Erie হ্রদ ও Ontario হ্রদকে যুক্ত করে সুদীর্ঘ নায়গ্রা নদী প্রবাহিত। নদী এই পথে যেতে যেতে মাঝে এক সুগভীর খাদের গর্তে ঝাঁপ দিয়েছে এবং সেখানে এক বিরাট জলপ্রপাতের মূর্তি ধারণ করেছে।

২রা জুলাই। আমাদের গাড়ী চলেছে নায়গ্রা নদীব ধারে ধারে। শান্তসলিলা নদী ক্রমশঃ স্রোতসঙ্কুলা হয়ে ছুটে চলল; কানে এল অদূরে স্রোতস্বিনীর ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, পাহাড়ে নদীর ঢেউ পাথরের ধাপে ধাপে আছড়ে পড়ে গড়িয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে নদী যেন সর্পগর্জন করে ফণা তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল—শেষে এক বিরাট গহ্বর-বক্ষে ঝাঁপ দিয়ে নদী ঝরণার আকারে সুললিত ছন্দে বেজে উঠল। শোভাময়ী প্রকৃতির অপূর্ব এ ছন্দ! নির্ঝরিণী কুয়াশাচ্ছন্না। প্রায় ২০০ ফিট উঁচু হতে জলধারাগুলি পাথরের গা বেয়ে গহ্বরে পড়ছে। জলপ্রপাতের সামনে জলকণার কুয়াশা উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে স্থানটিকে একেবারে অন্ধকার করে ঢেকে দিচ্ছে।

জলপ্রপাতের এপারে আমেরিকার সীমানার এক শেষপ্রান্ত এবং অপর পারে ক্যানাডার সীমানা আরম্ভ। পাশাপাশি দু'টি সুবৃহৎ ঝরণাধারার মধ্যে একটির নাম American জলপ্রপাত এবং অপরটি Canadian জলপ্রপাত। আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এক জায়গায় লেখা— "Wind Cave"; সেখান থেকে লিফ্‌টে করে লোকেরা দলে দলে জলপ্রপাতের পাদদেশে নামছে। স্থানটি ভীষণ বিপজ্জনক দেখেও আমাদের নামতে



নায়গ্রা জলপ্রপাত

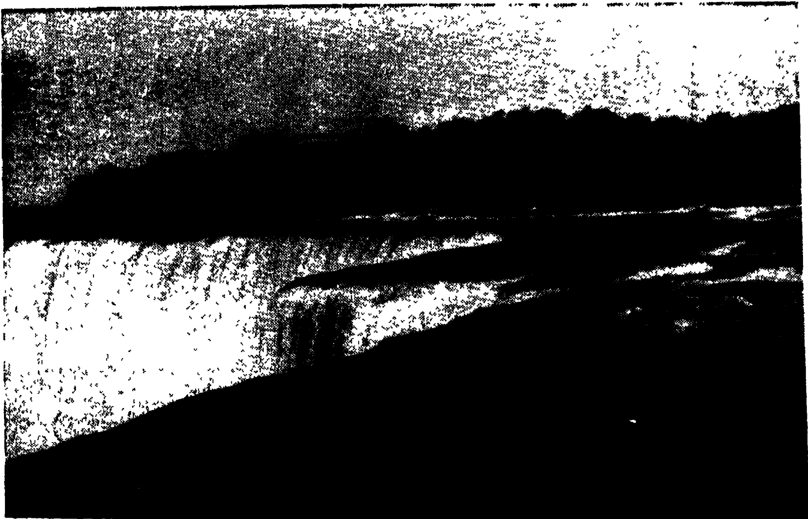
কৌতূহল হল। এখানে নামতে হলে নিজেদের কাপড়চোপড় বদল করে সর্বাঙ্গ ঢাকা একপ্রকার রবারের পোষাক (নাম Monkey dress) পরতে হয়। আমরা সেই পোষাক পরে লিফ্‌টে করে ১৭০ ফুট নীচে নেমে জল-প্রপাতের রুদ্রমূর্তির সামনে এলাম। সামনেই রয়েছে জলের উপরে পাথরে গাঁথা কাঠের সেতুগুলি; সেতুর উপরে দাঁড়ালে জলপ্রপাতের আরো

নিকটবর্তী হওয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টা সেতুর উপরে বয়ে এসে চারিদিকে জলকণা ছিটিয়ে স্থানটি ভিজিয়ে অন্ধকার করে ঢেকে



নায়গ্রা জলপ্রপাত

দিচ্ছে; তখন শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াই কষ্টকর। সেই কুয়াশার ঝাপ্‌টা সরে গেলেই দেখা যাচ্ছে বহু বর্ণের রামধনু অর্ধচন্দ্রাকারে জলপ্রপাতের পাদদেশ



নায়গ্রা জলপ্রপাত

ঘিরে জ্বল জ্বল করছে! এ-হেন বৈচিত্র্যের ভিতরে ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিছল পথে সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। জলের ঝাপটা যখন আসে তখন শক্ত করে হাতল ধরে অন্ধকারের মাঝে



Monkey dress প'রে আমরা

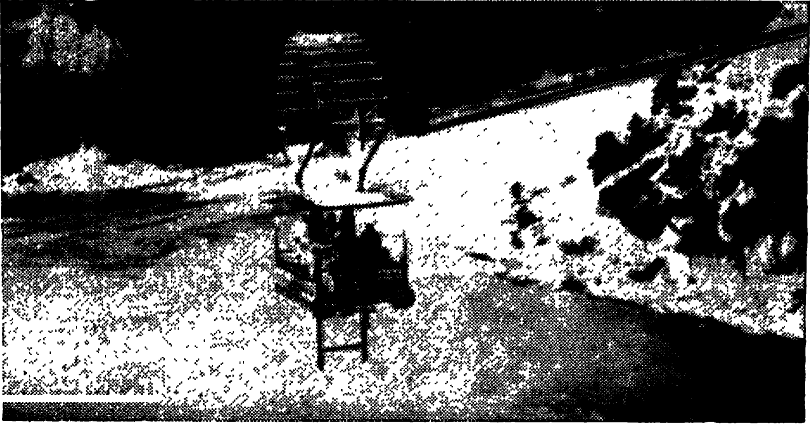
থাকি, আবার একটু এগোনো হয়। ভয় এবং দুঃসাহসিকতার উন্মাদনায় বেশ এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল।



ক্যানাডার দিকে থেকে জলপ্রপাতের দৃশ্য

আমরা উপরে উঠে এসে নায়গ্রা নদীর ব্রীজটি মোটরে করে পার হয়ে ক্যানাডার জমিতে নামলাম। এই ব্রীজ পার হবার সময় প্রবেশ-দ্বারে পাসপোর্ট দেখাতে হল। ক্যানাডার দিক থেকে জলপ্রপাতের দৃশ্য অতি অপূর্ব—জলধারাগুলির ভিতর থেকে নানা রঙের আভা ফুটে উঠ্ছে। আমরা সামনেই একটি রেষ্টুরেণ্টের ছাদে বসে আহারাদি করলাম।

জলপ্রপাতের অপরদিকে বেড়াতে বেড়াতে নায়গ্রা নদীর ধারে এসে দেখি, একস্থানে গভীর খাদের ভিতরে জল-তরঙ্গ উন্মাদের মত ঘূর্ণিপাক দিয়ে ছুটেছে। আবার তার উপরে, খাদের এ পাহাড় হ'তে অপর



নায়গ্রা নদীর উপর তীরে ঝুলানো·দোল্না গাড়ী

পাহাড় অবধি তারে ঝোলানো এক রকম দোল্নার গাড়ী (Aerial Cage) যাত্রী নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে এ-পার ও-পার করে বেড়িয়ে আসছে। দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা !

আমরা আবার জলপ্রপাতের ধারে ফিরে এলাম। তখন আকাশ সূর্যের ম্লান আলোয় ঢেকে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে জলপ্রপাতের উপরে উঠে দাঁড়াল। আঁধার রাতে চাঁদের আলোয় রূপালী ঝরণা ধারা ঝিক্-মিক্ করে উঠল।

আমরা অভিভূত হয়ে চাঁদের আলোয় নির্ঝরিণীর অপূর্ব নৃত্যলীলা দেখছি এমন সময় পিছন দিক্ থেকে বড় বড় ফ্লাড লাইটের ডগমগে গাঢ় রঙ জলের

উপর ফেলে জলপ্রপাতটিকে একেবারে কৃত্রিম আলোয় রঙীন করে তোলা হল। এমন প্রাকৃতিক রূপমাধুরী বিকৃত কৃত্রিমতায় ম্লান হয়ে গেল।

৩রা জুলাই। আমরা বাফেলো শহর থেকে নিউইয়র্কে এলাম। হোটেল প্লাজাতে এসে দেখি চারিদিক জনশূন্য, কোথাও একটি লোকের দেখা মেলে না। অফিসের সামনে অপেক্ষা করে করে শেষে যাহোক একটি ঘরে তো ওঠা গেল। লিফ্‌টে ওঠার সময় দেখি মদ্যপায়ী লিফ্‌টম্যানটি দাঁড়িয়ে টলমল করছে।

আগামী কাল ৪ঠা জুলাই শুক্রবার, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। শহরশুদ্ধ লোক এই তিনদিনের ছুটীতে শহর ছেড়ে চলে গেছে সমুদ্রের ধারে, নদীর তীরে, পল্লীবাসে, বাগানে ও খোলা মাঠে তাঁবু মেলে থাকতে, সেখানে তারা মহানন্দে হৈ চৈ করে দিন কাটাবে। আজই অর্ধেক শহর খালি হয়ে গেছে ; এদেশে আবার শনি ও রবি দু'দিনই পুরো ছুটী থাকে। আজকের দিনটি মাত্র অফিস ও দোকানপাট খোলা আছে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই Pan American Air office-এ যাওয়া গেল ; আমাদের ডাব্‌লিন্ যাত্রার জন্য বিমানের যথাযথ বন্দোবস্ত হয়েছে কিনা জেনে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে বেরিয়ে Dr. Taylor-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেখে ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী ভারি খুশী। আমাদের আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হল শুনে তখনই আবার নিমন্ত্রণ করে রাখলেন পরের বারে আসার জন্য এবং তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্য। আমরা কিছুক্ষণ বসে গল্প করলাম। কথা প্রসঙ্গে উনি একবার Dr. Taylor-কে বল্লেন যে, আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমেরিকা সত্যই শীর্ষস্থান লাভ করেছে এবং আমাদের এই বাস্তবজগতের এক অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটা তো সমগ্র মানবজীবনের একটা দিক মাত্র। জীবনের আরেকটি দিক—যেখানে মানুষ তার এই বস্তু জগতের উর্ধ্বে সেই অধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আত্মাজ্ঞানের চিন্তা ক'রে এক পরম বিস্ময়কর আনন্দ আস্বাদ করে গেছে, তার সন্ধান আজও আমেরিকা পায়নি। হয় তো একদিন এই ভোগ উপশমের পর এ দেশেও তার অনুসন্ধিৎসা জাগবে। Dr. Taylor গভীরভাবে সমস্ত কথা শুনে বল্লেন,— "তুমি যে বলছ ভোগ পরিতৃপ্তির পর আমেরিকার বিতৃষ্ণা আসবে,

তা আমার মনে হয় না। তা যদি হত তা হ'লে Christ প্যালেষ্টাইনের একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ না করে বিশ্বের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নগর রোমেই জন্মাতেন।" কথাগুলি শুনে বড় ভালো লাগল। Dr. Taylor শুধুই বিশ্ববিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ নন্, তিনি একজন চিন্তা-জগতের মনীষী ও অন্তর্মুখী দার্শনিকও বটে।

৪ঠা জুলাই। আজ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সকালে উঠে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখি রাস্তা জনমানবহীন ;—ট্রাম নেই, বাস নেই, Skyscraper-এর ফাঁকা ঘরগুলি যেন মহাশূন্যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় আহার মিলবে ভেবে না পেয়ে শেষে খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট রেষ্টুরেন্ট খোলা দেখে—ভিতরে গেলাম। সেখানে অল্প কিছু আহার করে Empire State Building দেখতে যাওয়া গেল। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটির ভিতরে Express Elevator-এ করে আমরা একদমে ৭৪ তলায় উপস্থিত হলাম। এই Express Elevator-এর নিয়ম হচ্ছে কোনো তলায় না থেমে একেবারে একদমে ৭৪ তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ৭৪ তলার খোলা ছাদে গিয়ে দেখি ভীষণ কন্‌কনে হাওয়া বইছে। চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন, কোথাও কোথাও কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে skyscraper-এর বাড়ীগুলি একটু উঁকি মারছে। নিজেদের খানকয়েক ছবি তুলে ঘরের ভিতরে গিয়ে Cafeteria-তে আইসক্রীম খেতে বসলাম। তারপর আরেকটি Elevator-এ করে আরো ২৮ তলা উপরে উঠে ১০২ তলার ঘরে এলাম। এখান থেকে শহরের দৃশ্য দেখে এমন কিছুই নূতন লাগল না। কারণ আমরা বিমান থেকে দেশ দেশান্তরের ও সহরের যে অপূর্ব ছবি দেখেছি তার তুলনাই নাই।

সারাদিন ঘুরে হোটেলে ফিরে খবরের কাগজটি নিয়ে বসেছি। কাগজের পাতা উল্টে দেখি সামনেই বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—লণ্ডনের হাউস অফ্ কমন্সে ভারতের Independence Bill পেশ করা হল।

স্বাধীনতার নামটুকু শুনেই খুকু আমায় জিজ্ঞাসা করল,—"তবে কি আমরা স্বাধীন হলাম, মা ?"

স্বাধীন হবার আনন্দ যে আজ শিশুমনেও জেগেছে সে কথা শুনে আমার সত্যই আনন্দ হল।

পরদিন সকালে উনি গেলেন হাসপাতালের কাজে। আমরা বসলাম খবরের কাগজের বোঝা নিয়ে। এ দেশের দৈনিক খবরের কাগজ চৌষট্টি পৃষ্ঠারও বেশী হয়ে থাকে, কাজেই দোকান থেকে এই কাগজের বোঝা কিনে বয়ে আনবার জন্য সঙ্গে লোক থাকলেই ভালো হয়। আমি কাগজের পাতা উল্টে দেখি সামনেই রয়েছে জনমানবহীন নিউইয়র্কের রাজপথের ছবি, এবং পাশেই আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে Conney Island অভিমুখে যাত্রারম্ভ একখানি যাত্রী বোঝাই ট্রেনের দুরবস্থার দৃশ্য। ট্রেনের কামরার জানলাগুলি দিয়ে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ভিতরে ঢুকছে এবং বাইরেও ঠেসাঠেসি করে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। নীচে বড় বড় হরপে লেখা রয়েছে—৪ঠা জুলাই, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে জলে ডুবেছে ১২৫ জন, গাড়ী চাপা পড়েছে ৭৫ জন এবং আরো ৭৫ জনের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে।

আমরা আজ রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিখিলানন্দের সাথে দেখা করতে গেলাম। সেখানে অনেকদিন পরে স্বামীজীর হাতের রান্না কপির ডালনা, মাছের ঝোল, ডাল ও ভাত খেয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করলাম।

রাতে হোটেলে ফিরে বাক্স গোছানোর পালা সুরু করা গেল। আগামী কাল ভোরেই আমরা 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র' ছেড়ে চলে যাব।

৬ই জুলাই। ভোর ৬টায় ডাব্লিন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। Pan American Air Terminus-এ উপস্থিত হয়ে খবর নিতে গিয়ে দেখি, একটি লোক আধ-ঘুমঘোরে ঢুলতে ঢুলতে উত্তর করছে—আজ বিমান ছাড়বে না। তাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বলল,—হয়তো বিকালে ছাড়লেও ছাড়তে পারে। বিমান ছাড়ার কোন সঠিক খবর জানা গেল না; আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। আবার আমরা হোটেলে ফিরে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমলাম; তারপর কফি খেয়ে বাইরে বেরিয়েছি। মনে পড়ল, আমেরিকা তো ছেড়ে চলেছি কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনতার মূর্তি —Statue of Liberty তো দেখা হয় নি। আমেরিকার প্রবেশ দ্বারে নিউইয়র্কের বন্দরের ঠিক সম্মুখেই একটি ছোট্ট দ্বীপে মূর্তিটি স্থাপিত। জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে, প্রথমেই চোখে পড়ে এই মূর্তি। আমরা একটি Ferry-তে করে বেড্‌লো দ্বীপে গেলাম; দ্বীপে নেমে Elevator-এ

করে ২০ তলা উপরে মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হলাম। মূর্তিটির ভিতরে ১২০ ধাপ সিঁড়ি মাথার মুকুট অবধি উঠে গেছে; মুকুট হতে বন্দরের দৃশ্য বহুদূর অবধি দেখা যায়। ফরাসী শিল্পী Bartholdi মূর্তির নির্মাতা। স্বাধীনতার প্রতীক এই মূর্তিটি তৈরি করে ফরাসীরা আমেরিকাবাসীদের উপহার স্বরূপ পাঠায়।

এই নারী-মূর্তিটির এক হাতে রয়েছে বই ও অপর হাতে মশালের আলো। মূর্তিটি এত বিরাট যে মুকুটের পরিধির উপরে ৪০ জন লোক অনায়াসে দাঁড়াতে পারে।



নিউইয়র্ক বন্দর—Skyline

আমরা আবার ফেরিতে করে বন্দরে ফিরে হোটেলে উপস্থিত হলাম। Air office-এ ফোন করে খবর নিতেই তারা বল্‌ল—বিমান সকাল ৯॥টায় ছেড়ে গেছে। হতবুদ্ধি হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে তখনই Air terminus-এর দিকে ছুটেছি। P. A. A. অফিসে গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল তাদের কোন বিমানই ছাড়েনি এবং আজ কোন বিমান ছাড়বেও না।

Dublin Medical Conference-এর জন্য ওঁকে ৭ই জুলাইয়ের পূর্বে ডাব্‌লিনে পৌছতেই হবে। সুতরাং উনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অন্য যে কোনও

বিমানে আজই যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সকল কোম্পানী হতেই উত্তর আসে—আজ আর কোন বিমান ছাড়বে না, কারণ, কোন লোক কাজে আসে নাই। যা-হোক শেষকালে American Overseas Airline-এ আমাদের তিনটি সিট মিলল। বিমান আজই রাত ৮টায় যাত্রা করবে।

প্রকাণ্ড চার ইঞ্জিনের বিমান, কিন্তু যাত্রী আমরা ১০ জন মাত্র; বাকি সমস্ত সিটই খালি চলেছে। আমরা আমেরিকার মাটী ছেড়ে আকাশে উড়ে চললাম। আমি জানালার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল ইঞ্জিনের গা দিয়ে আগুনের শিখা ছুটছে। ভীষণ ভয় পেয়ে ষ্টুয়ার্ডেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, আগুন কিসের? সে অভয় দিয়ে জানালো, ওটা কিছু নয়, পুরাতন মডেলের বিমানে Exhaust fire বেরোবার জায়গা পাশেই থাকে, সেইটাই ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে। নতুন বিমানে নাকি ইঞ্জিনের নীচের দিকে থাকে। আমরা তো চলেছি।

ক্রমে রাতের অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে গেল; আমরা আটল্যান্টিক মহাসাগরের উপরে শূন্যে ভাসতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি ষ্টুয়ার্ডেশ Air Jacket পরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল; তারপর প্রত্যেক যাত্রীর কাছে গিয়ে Air Jacket-টির ব্যবহার প্রণালী দেখিয়ে দিতে লাগল। আমাদের ভয় আরো বাড়ছে, মনে মনে ভাবনা হচ্ছে যে, বিপদের সম্ভাবনা হয় তো রয়েছে, তাই এই সতর্কবাণী। শেষে ষ্টুয়ার্ডেশ যখন আমাদেরও সামনে এসে Air Jacket-এর ব্যবহার বিধি দেখিয়ে দিল—শূন্যে কেমন করে লাফিয়ে পড়ে প্যারাসুট খুলতে হয়, রবারের জ্যাকেট ফুলিয়ে জলে ভাসতে হয়, এবং অক্সিজেন ঘ্রাণের জন্য কি ব্যবস্থা আছে, তখন খুকুকে আমি আর কিছুই দেখতে দিলাম না; আমার নিজেরই হাত পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। উনি আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন,—"ও সব আর দেখাতে হবে না, বিপদ যদি আসে তো ও সব খোলাখুলির আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

আমি ষ্টুয়ার্ডেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সবের দরকার কি, আমরা তো বহু বিমানে ঘুরেছি কিন্তু কোথাও তো এ সকল দেখিনি। সে হেসে বল্লে, সারা রাত আমরা তো মহাসাগরের উপরে কাটাব এবং তার উপর এই লাইনে পর পর তিনটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে শেষ হয়েছে। এই চতুর্থ বিমানে আমরা চলেছি, সুতরাং সমস্ত কিছুই আমাদের জেনে রাখা বিশেষ

কর্তব্য। তখন বুঝলাম, বিমানখানিতে কেন এত কম যাত্রী। পর পর ভীষণ তিনটি দুর্ঘটনা হওয়াতে লোকে ভয়ে আর এই কোম্পানীর বিমানে চড়ছে না।

রাত্রি সুগভীর। যাত্রীরা সব অঘোরে ঘুমচ্ছে, আমি যথারীতি জেগে বসে মাঝে মাঝে পরদা ফাঁক করে বাইরে তাকাচ্ছি। ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে বিমান তীরবেগে ছুটেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কালো আকাশে সোনালিআভামণ্ডিত একখানি লালচক্র উঁকি মারছে, ভাবলাম চাঁদ উঠছে হয়তো। দেখতে দেখতে ভোরের আলো দেখা দিল। আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন সবে ১টা বাজে।

সূর্য্য উঠছে! সুপ্রভাত! কেমন যেন অবাক লাগল। সময়ের পার্থক্যে এখন এখানে উষাকাল।

আমরা বিশ হাজারফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। আমাদের পথ চলা আর ফুরোয় না। মনে হচ্ছে মৃন্ময়ী ধরিত্রীকে বুঝি আমরা হারিয়ে ফেলেছি!

একটু পরেই দেখি, বিমান ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে সুরু করেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল সরু সূতার মত ফেনার দাগটানা সুদীর্ঘ তীররেখা। আমরা মহাসাগর-সীমানা পেরিয়ে আয়ারলণ্ডের উপর চলে এলাম। বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলল, বিমান আয়ারলণ্ডের Shanon-এ নেমে দাঁড়াল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আরেকটি বিমানে করে ডাবলিন রওনা হলাম।

ডাব্লিন

ডাব্লিনে Rotunda হাসপাতালের ছাত্রাবাসে আমাদের জন্য হু'টি ঘর ঠিক করা হয়েছে। এখানকার Lady House Keeper আমাদের থাকার যথাযথ বন্দোবস্ত করে ঘরে মালপত্তর তুলে দিয়ে প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিলেন। প্লেনের গোলমালের দরুণ আমাদের পৌছতে একটু দেরীই হয়েছিল। তাই উনি মিটিংএ যোগ দিতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

মেঘলা আকাশ, বাইরে ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা আর বেড়াতে না গিয়ে ঘরেই বিশ্রাম করলাম।

বিশ্ববিখ্যাত Rotunda হাসপাতাল আজ ২০০ বৎসরে পদার্পণ করল। সেই উপলক্ষেই এখানে এই International Medical Congress আহ্বান করা হয়েছে। দেশবিদেশের বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক আহূত হয়ে এসেছেন। আমাদের এই হোষ্টেলটিতে অনেক বিদেশী অতিথি এসে উঠেছেন এবং বাকি ঘরগুলি কলেজের ছাত্রছাত্রীতে ভর্তি।

আজ রাত ৯টায় ইউনিভারসিটির তরফ থেকে অতিথিদের জন্য একটি Reception-এর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বহু ভারতীয়ের সাথে দেখা হল। তারপর ছবি তোলার পালা শেষ হলে ঘরে ফিরলাম।

৮ই জুলাই। সকাল ৮টায় উনি Medical Congress-এ যোগ দিতে চলে গেলেন। আমার জ্বর-ভাব হওয়াতে সারাদিন ঘরেই রইলাম। Lady House Keeper আমার সেবা যত্ন খুবই করছেন। তিনি খুকুকে একলা থাকতে দেখে তাঁর অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে বইএর গোছা দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

৭ তারিখ হ'তে ১২ তারিখ অবধি এই কংগ্রেসের অধিবেশন চলল। রোজই রাতে অতিথিদের আপ্যায়িতের জন্য নানাস্থানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগল ১০ই তারিখে বিকেলের Garden Party-টি।

এখানে অনেকের সঙ্গেই বেশ সহজ এবং সুন্দরভাবে আলাপ পরিচয় হয়েছে বটে, তবে আইরিশদের দেশ-প্রতীক De Valera-র কথাটাই বেশী করে মনে পড়ছে। অতি অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরেই কথাবার্তা হল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ De Valera জিজ্ঞাসা করলেন,—"সত্যই কি তোমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের problem খুব acute ?"



রোটাণ্ডা হাসপাতাল উদ্যানে

উনি বল্লেন,—"একটুও না। আমরা বহু বছর একসঙ্গে একজায়গায় বাস করছি; এ সমস্যা কখনও ওঠেনি। এটি সম্পূর্ণ man-made problem এবং তুমি আমার চেয়ে ভালো জান, কারা এই বিরোধ সৃষ্টি করেছে।"

De Valera শুনে বললেন,—"ঠিক বলেছো, ডাঃ মিত্র। আমি জানি, ইংরেজদের এটা প্রকৃতিগত কুটিল স্বভাব। আমরাও 'আলষ্টার' নিয়ে সেই কারণে অনেক কষ্ট পাচ্ছি।" এমনি খোলাখুলি কথাবার্তা ও অমায়িক ব্যবহার দেখে আমরা মুগ্ধ।

শেষকালটায় De Valera বল্‌লেন,—"যদি পার ত হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের ভিতর একটা কিছু common link রাখতে চেষ্টা কোরো—নইলে পরে মুস্কিল হবে। আমিও সেইজন্য ইংরেজদের সঙ্গে কিছু যোগ রেখেছি—নইলে Northern Ireland আমাদের একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বল্লেন,—"গান্ধীকে Christ-এর মত সম্মান করতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর policy-তে কোনও দেশ স্বাধীন হ'লেও সে নীতি



ডাবলিনের রাজপথে ডাঃ ঘোষ ও আমরা

Civil war বন্ধ করতে পারবে না। সেখানে হাতের জোর থাকা চাই এবং দরকার হলে সে জোর কাজেও লাগাতে হবে।"

উনি বল্লেন,—মহাত্মাজী তো তার বিরোধী নন। Do or Die তাঁর নীতি। প্রয়োজন হ'লে জোর দেখাতে হবে বৈকি।

ভদ্রলোক শুধু চিন্তাশীল ভাবুকই নন, মহা কর্মীও বটে। মুক্তি-মন্ত্রের কৃচ্ছ্রসাধকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আজ বড় আনন্দ হল।

১৩ই জুলাই। আজ এখানকার India League-এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতীয়গণ এক অধিবেশনের আয়োজন করেছেন; চায়ের নিমন্ত্রণে সকলকে ডাকা হয়েছে। ওঁকেই গ্রহণ করতে হল Guest-in-Chief-এর আসন। বহু বিশিষ্ট আইরিশ ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে তাঁদের

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একজন আইরিশ বক্তা বল্লেন যে, আয়ারলণ্ড দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরে বৃটিশের করায়ত্তে থেকে যে দুঃখদুর্দশা বহন করেছে, তা অবর্ণনীয়। কিন্তু বহুকাল ধরে এই নিদারুণ দুঃখদুর্দশার মধ্য দিয়ে এসে তারা আজ স্বাধীনতার আলোক পেয়েছে। ভারতও দুই শত বৎসর ধরে এই পরাধীনতার দুঃখ ভোগ করে আসছে, আজ তারও মুক্তি আসন্নপ্রায়। (তখনও ভারত স্বাধীন হয় নাই)। ভারত ও আয়ারলণ্ডের ভাগ্য যেন এক অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা! সভার সকলেই ভারতের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানালেন।

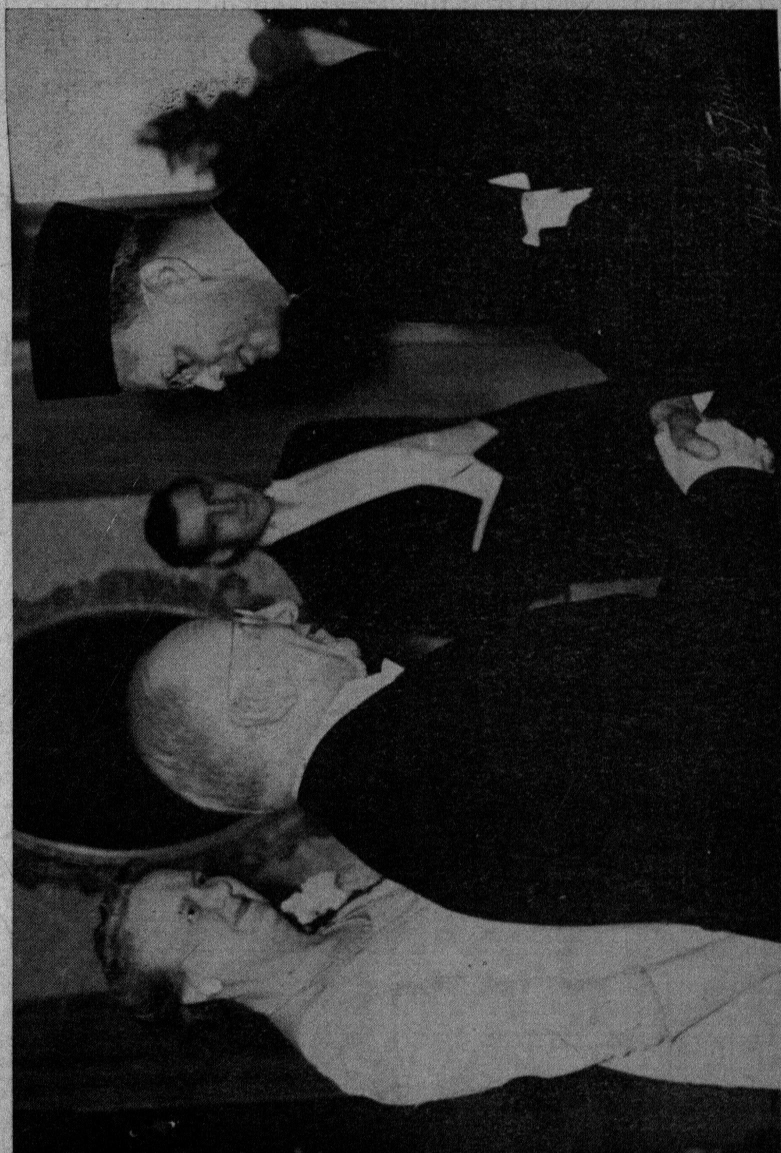
১৪ই জুলাই। সকালে একটি ট্যাক্সিতে করে শহরের বাইরে বেড়াতে গেলাম। শহরের বাইরে সবুজ মাঠের শোভা দেখে মনে পড়ল বাঙ্গলার কথা। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মতই দেশটি উর্বর, ছোট ছোট ক্ষেত শস্যে পরিপূর্ণ। বহুদূরে মাঠের শেষপ্রান্তে প্রাচীরের মত ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দেশটিকে ঘিরে আছে।

চাষের ফসলে ও পশুপালনে গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। দেশে খাদ্যের অভাব নেই, যদিও সম্প্রতি এই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হেতু অল্পবিস্তর অনটন ঘটেছে। দেশে শীতের প্রকোপ যেমন, সারা বছর ধরে বৃষ্টির অত্যাচারও তেমনি।

আমরা মদ তৈরীর কারখানার পাশ দিয়ে Derby-র ঘোড় দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে শহরের অপরদিকে চললাম। কিছু দূর গিয়ে ড্রাইভার একটি বাড়ী দেখিয়ে বলল, এই বাড়ীটিতে মৃতদেহকে 'মমি'তে রূপান্তরিত করা হয়।

হাসপাতালে ফিরে Lady House Keeper-এর হিসাব চুকিয়ে বিদায় নিলাম। এয়ার অফিসের সামনে এসে দেখি, আমাদের পরিচিত Air Officer-টি তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে সঙ্গে করে এসেছেন আমাদের বিমানে তুলে দিতে।

আইরিশরা যেমন অমায়িক, তেমনই ভদ্র। এদের ব্যবহারে প্রত্যেক ভারতীয়ই অতিশয় সন্তুষ্ট। কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে শুনলাম যে, কলেজের সহপাঠী আইরিশ বন্ধুগণ ভারতীয়দের সকল সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে এবং তাদের কাজের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও বন্দোবস্ত করে দেয়।

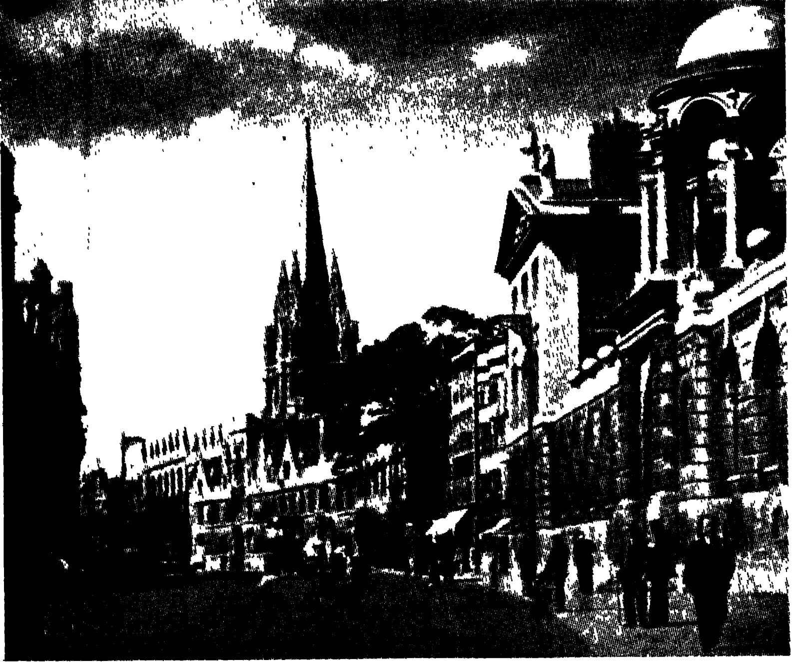


আয়ারলণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মিত্রকে অভিবাদন জানাচ্ছেন

ষোল

যাত্রা শেষে

বেলা ৩টের সময় Air Lingus-এর বিমানখানি আকাশে উড়ল। ছোট বিমান বেশ নীচে দিয়ে চলেছে। নীচে তাকালেই মনে হয় এই বুঝি গাছের ডগায় আটকে গেলাম। আমরা সাগর পেরিয়ে ইংলণ্ডের উপরে চলে এলাম। স্তবকে ঢাকা মেঘের স্তর ভেদ করে বিমান মাটীর দিকে নেমে চলল। আমরা লণ্ডনের ইটরো বিমানঘাঁটীতে নেমে দাঁড়ালাম। তারপর আবার সেই Baileys Hotel-এ গিয়ে মালপত্তর নিয়ে ওঠা।



অক্সফোর্ড

আমাদের ঠিক ছিল আয়ারলণ্ড থেকে গ্লাসগো হয়ে আমস্টারডাম্ ও প্যারিস শহর দেখে লণ্ডনে ফিরব। সেই মত টিকিট ও হোটেলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু এতটা ঘোরার পর আমার ও খুকুর শরীর বড়ই ক্লা হয়ে পড়েছে। তার উপর আবার যাত্রার শেষ দিকটায় দেশের জন্য মনটাও ব উন্মুখ হয়েছে। তাই, এবারকার মত ওটুকু বাদ দিয়েই সরাসরি লণ্ডনে চলে এলাম। এখানে পৌঁছে যেন একটা স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেল্লাম। জানি ন

কেন লণ্ডন শহরটা এবার একটু বেশীই ভালো লাগছে। এখানে Skyscraper-এর সারি মুক্ত আলো বাতাস ও দৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে অভ্রভেদী প্রাচীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। চারিদিকের এই খোলা আলো হাওয়া যেন শ্রান্ত দেহের বিশ্রামের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন।

এখন ঘরমুখী মন। প্রতিদিনই উৎসুক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছি কবে স্বদেশে ফিরব। আমরা প্রায় ১০দিন এখানে রইলাম। একদিন আমরা মোটরে করে অক্সফোর্ড বেড়াতে গেলাম।



কবি সেক্সপীয়রের জন্মভূমি

লণ্ডন হ'তে অক্সফোর্ডের দূরত্ব প্রায় কেম্‌ব্রীজেরই মতন। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ায় এতটা দূর পথ এসেও কোন শ্রান্তি বোধ করি নাই। রাস্তাটি খুব পরিষ্কার ও মসৃণ। অক্সফোর্ড শহরটি ছোট কিন্তু বেশ মনোরম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঐ কেম্‌ব্রীজেরই মতন অনেকগুলি কলেজের সমষ্টি। কলেজ অট্টালিকাগুলি অতি প্রাচীন। রাস্তাগুলি সরু সরু। বাইরে চাকচিক্যের বালাই কোথাও নেই। দেখলাম, রাস্তাজুড়ে ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে সাইকেলে চলেছে। সারাদিনটা কাটিয়ে আমরা সন্ধ্যায় লণ্ডনে ফিরলাম।

খুকুর ইচ্ছায় সেক্সপীয়রের আবাসভূমি দেখতে অ্যাভন নদী উপকূলে Stratford শহরে আর একবার গেলাম। সেক্সপীয়রের

বাড়ীর প্রত্যেক কোণটি খুকুর জানা। সে Loreto স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছে, কোথায় সেই চেয়ারখানা, যেখানে বসে তিনি অমূক বইখানা লিখেছিলেন, কোথায় সেই Statue-টি যেটি সেক্সপীয়রের বসবার ঘরে ছিল ইত্যাদি। এই সব দেখেশুনে মনে হচ্ছিল শিশুদের দেখবার এবং জানবার কত সাধ, কি উৎসাহ। আজ যে সেক্সপীয়র সম্বন্ধে সে এত সজাগ, তার কারণ স্কুলে সে সেক্সপীয়রের বিষয় অনেক কিছু পড়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কেন খুকুর মত ছেলে-মেয়েরা এ দেশেও কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানতে এই রকমভাবে অনুপ্রাণিত হবে না? কোথায় আছে সেই ধরণের বই এবং কেই বা আমাদের ছেলেমেয়েদের এই সব মহামনীষীর কথা শেখাবে।

আমরা ২৮শে জুলাই রাত ৯টায় লণ্ডন ছেড়ে ভারতের দিকে যাত্রা করলাম। আমাদের এই যাত্রার উদ্যোগপর্বটা খুব নির্বিঘ্নে হয়নি; কেননা, Pan American বিমানটির ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার জন্য আমাদের যাত্রার তারিখ দু'দিন পিছিয়ে গেল। পথে বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু ইস্তাম্বুলে আবার সেই ইঞ্জিনের গোলমাল হওয়ার জন্য পুরো একদিন এরোড্রোমেই বসে থাকতে হল।



অ্যাভন নদীর তীরে লেখিকা ও কন্যা

পরদিন বেলা ১টায় আমরা কলিকাতায় পৌছলাম।

বাংলার মাটী, বাংলার গাছপালা, বাংলার পথ ঘাট মাঠ, বাংলার ঘরবাড়ী যে এত সুন্দর, এত মধুর তা সারা পৃথিবী ঘুরে এসে আজ প্রথম অনুভব করলাম।

বন্দেমাতরম্!

সমাপ্ত